সুলতান
গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী

মাওলানা আবু তালহা আনসারী

সুলতান গাজী
সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী

সুলতান গাজী
সালাহউদ্দীন আইয়ূবী

মাওলানা আবু তালহা আনসারী

দারুল উলূম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন — ২০০৮
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন— ২০০৫

প্রকাশক ◗ **শহীদুল ইসলাম**, দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড) ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইল ঃ ০১৭১২-৫০৭৮৭৭, ০১৯১৮-১৮৮০৮৫ **প্রচ্ছদ** ◗ নাজমুল হায়দায়
কম্পিউটার কম্পোজ ◗ এম. হক কম্পিউটার্স

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Sultan Gazi Salah Uddin Ayubi : Writen By Abu Talha Ansari, Publishd By Shahidul Islam Darul Ulum Librari, Islami Tower (Underground), 11/1 Banglabazar, Dkaka-1100. Mobile : 01712507877, 01918188085

PRICE : TAKA SIXTY ONLY

ISBN : 984-8409-04-1

সূচীপত্র

জন্ম, বংশ পরিচয়, উত্থান ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় ১৩
বংশ তালিকা ও শাসক বর্গ ১৩
ফাতেমীয় খেলাফত ১৪
সালাউদ্দীনের পরিচয় ও উত্থান ১৫
ক্রুসেডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৬
ক্রুসেডের সার কথা ১৮
ক্রসেড যুদ্ধের পূর্ব প্রেক্ষাপট ২২
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পূর্ব অবস্থা ২৩
চার্চের উদ্ভব ২৭
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে চার্চের প্রভাব ২৮
ক্রুসেড-পূর্বকালীন মুসলিম প্রাচ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিঃ ২৯
বিশ্বনবীর (সাঃ) আগমন ৩৬
সেকালের বাণিজ্য সমাচার ৪১
মুসলিমদের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ৪৪
ঐতিহাসিক জেরুজালেম ৪৮
ক্রুসেড বনাম ইসলামী জিহাদ ৫৮
সালাহউদ্দীনের চরিত্র ও কৃতিত্ত্ব ৭২
ক্রসেড ও তার ফলাফল ৭৬
তবুও ক্রুসেড থেমে থাকেনি ৭৭
সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর উত্তরাধিকার ৮০
যে চরিত্র ভোলা যায় না ৮০
ক্রুসেড যুদ্ধের তথ্য কণিকা ৮৫

ক্রুসেডার তিন শক্তি ৮৫
মুসলিম বিশ্বের দুর্যোগের তিন কাল ৮৫
একনজরে সুলতান সালাহ্উদ্দীনের জীবনপঞ্জী ৮৬
সংক্ষিপ্ত জীবনালেক্ষ্য ৮৭
ক্রুসেডের ঘটনা প্রবাহ ৯০
খৃষ্টান বাহিনীর গণহত্যার লোমহর্ষক বর্ণনা ৯৫

উৎসর্গ

নিজেদের তপ্তরক্ত ঢেলে দিয়ে

দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের

জন্যে যে সমস্ত মুজাহিদ

দিবা-রাত্রি সংগ্রামে

লিপ্ত তাদের

উদ্দেশ্যে... ।

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা আবু তালহা আনসারী রচিত 'সুলতান গাজী সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী' এক কালজয়ী গ্রন্থ্। ১১৭৫ সালে বাগদাদের খলীফা কর্তৃক সুলতান সালাহ উদ্দীনকে ফরমান দান করেন আল মাগরিব মিসর, লিবিয়া, ফিলিস্তিন, পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার অধিপতি রূপে। ফলে তিনি প্রাচ্যের মুসলিম শক্তির প্রধানতম পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১১৮৭ সালে তিনি হিত্তীনের যুদ্ধে খৃষ্টান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ক্রুসেডারদের মুসলিম নিধন স্পৃহাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেন।

যদিও আজো সেই ক্রুসেড বন্ধ হয়নি। মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত ফিলিস্তিন, ইরাক, বসনিয়া, কাশ্মীর, আফগানিস্তান প্রতিদিন অসহায় নারী ও শিশুদের আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হচ্ছে। আজ আরেকজন সালাহ্উদ্দীনের বড়ই প্রয়োজন। যিনি বর্তমান নব্য ক্রুসেডারদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে।

লেখকের সুনিপুণ হাতের ছোঁয়ায় জগৎ বিখ্যাত বীরের বীরত্বপূর্ণ জীবন গাথা সুন্দর ভাবে ফুঁটে উঠেছে। বর্তমান প্রজন্মের চাহিদার কথা চিন্তা করে গ্রন্থটি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে গ্রন্থটি বিশ্ব মুসলিমদের চোখ খুলে দিতে বিপুলভাবে সাহায্য করবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

বিনীত

প্রকাশক

লেখকের আরজ

ইতিহাস বলতে আমরা অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকেই বুঝে থাকি। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে যায় যা মানুষের মনে দাগ কাটে। এমন ঘটনাও দেখা যায় যার জন্য মানুষ তার বর্তমান চরিত্রকে সংশোধন করে নিতে বাধ্য হয়। আবার ইতিহাস বিখ্যাত এমন মনীষী ও দেখতে পাওয়া যায় যাঁদের জীবনেতিহাসে বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিক্ষাগ্রহণের বিষয় থাকে। তেমনি একজন মহান চরিত্রের অধিকারী মানব সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী। যাঁর নামে পাশ্চাত্য মায়েরা সন্তানদের ঘুম পাড়াতো। অথচ আমরা আজ তাঁর স্মৃতি ভুলে গেছি। সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী আজ এ ধরাধামে নেই। স্বাধীন মতের প্রতিষ্কন্তা মুক্তির আগ্রহে জাতিকে মুক্ত করে চলে গেছেন; পেছনে পড়ে রয়েছে তাঁর কঠোর কর্মময় জীবনের সাহায্যে উজ্জল আদর্শ। জাতি ও দেশ যুগে যুগে কাল থেকে কালান্তরে তাঁর এই প্রোজ্জল আদর্শ সম্মুখে রেখে তাঁর অজেয় সাধনার স্মৃতি স্মরণ করে চলবে; অন্তরীক্ষের মুক্ত গবাক্ষপথে তাঁর অমর আত্মা কওমের শিরে আশীষের শত ধারা ঢেলে দিবে। আজো তাঁর নাম মুসলমানদের মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। তাঁর ব্যক্তিত্বের স্মৃতি এখনো মুসলিম হৃদয়কে অণুপ্রাণিত করে। নব-প্রাচ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গাজী সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী ছিলেন নতুন দিনের সূর্যের মতই উজ্জল। তাঁর জীবন কথা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের জন্য দিক নির্দেশক। তিনি কখনও নিজের জন্য ভাবেননি। ভেবেছিলেন জাতির জন্য।

আমরা বর্তমান কালে এ সমস্ত মনীষীর কথা আর তেমন স্মরণ করি না। এদের জীবন কথাও বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা। ইসলামের ইতিহাস নামে যা কিছু পড়ানো হয় তা সঠিক ইতিহাস নয়। আমাদের ইতিহাস ত্যাগের ইতিহাস। অথচ শত্রুদের দ্বারা রচিত ইতিহাসে দেখানো হয় মুসলমান শাসকরা নারী ভোগী। মদাপ ছিল। তারা কুশাসন চালাত। সম্রাট শাহ্জাহান ও দরবেশ সম্রাট আওরঙ্গ জেবের চরিত্রেও কালিমা লিপ্ত করতে দ্বিধাবোধ করেনি তারা। চেপে রাখা ইতিহাস ও বাজেয়াপ্ত ইতিহাস নামে আল্লামা গোলাম আহমদ মুর্তজা তাঁর রচিত গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। গাজী সালাহ্উদ্দীনের চরিত্রে কালিমা লেপন করার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তারা তাঁর সৈন্য বাহিনীর ভেতর

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য নানা কৌশলে সুন্দরী নারী ও মদ পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। এতে তারা অল্প হলেও সফলতা লাভ করে। যদিও আইয়ূবীর খুব বেশি সৈন্য এতে বিভ্রান্ত হয়নি।

দীপ্তিহীন অমানিশার মধ্যে আমরা আজ বাস করছি এবং চলছে ইসলাম বিরোধী শাসন। কোনো ভাবেই এ অমানিশা দূর করার আগ্রহও অনুপ্রেরণা আমরা লাভ করছি না। অপারগতা এবং অনাগ্রহ্ আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে। এই আচ্ছন্ন থেকে, এ ঘোর অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। জাতিগত বিচ্ছিন্নতা তো মুসলমানদের আছেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফেরকাগত, গোষ্ঠীগত বিরোধ। বর্তমানে মুসলমানগণ শতধা বিচ্ছিন্ন। তাদের মধ্যে আজ কোন ঐক্য নেই। তাই আল্লামা ইকবাল তাঁর "জওয়াব ই-শিকওয়া" তে লিখেন।

"লাভ লোকসান এক তোমাদের এক মঞ্জিল, এক মোকাম,

এক তোমাদের নবী ও রসূল, এক তোমাদের দীন ইসলাম।

এক তোমাদের আল্লাহ্ এবং এক তোমাদের আল-কুরআন,

আফসোস, হায়! তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান!

তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত,

এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তি পথ।

(অনুবাদ ঃ গোলাম মোস্তফা)

ইসলামী ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা তাই বলে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিন্তানায়ক, ড. আল্লামা ইকবালের কবিতায় সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীর চেতনা ফুটে উঠতে দেখা যায়।

"উঠ!

ছুড়ে ফেল এই বন্দি কারাগারের ঘেরাটোপ

ছড়িয়ে পড় বিশ্বে।

মুসলমানদের কাছে সব দেশই তাঁর স্বদেশ।

তাঁর স্থান দেশাতীত।

যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও, ভেঙ্গে দাও,

ইট আর পাথরের তৈরী পৃথিবীর সীমানা।

এসো, সবাই মিলে আমরা ধৌত করি বস্তুতান্ত্রিকতার ক্লেদাক্ত শরীর।"

সত্যি কথা বলতে কি ভৌগলিক সীমানার প্রাচীরে ঘেরা-যমীন মুসলমানদের সীমানা সীমাবদ্ধ নয়। সুলতান সালাহ্উদ্দীনের জেহাদের প্রভাব তাই তৎকালীন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নেই। আজো সেই জেহাদী জযবায় উজ্জীবিত হয়ে ফিলিস্তিন কাশ্মীর, আফগানের তৌহিদী জনতা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। আইয়ুবীর জেহাদী প্রেরণা চিরকালের ইসলামী গণজাগরণে সহায়ক ও নেয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

দীর্ঘদিন থেকে সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীর উপর কিছু লেখার জন্যে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় তেমন কোন লেখা প্রকাশ না হওয়ায় বিষয়টি সাজাতে খানিকটা বেগ পেতে হয়েছে। আমার প্রথম রচনা 'নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ও আজকের মুসলমান' দ্বিতীয় রচনা 'বাগদাদের কান্না'র পর এবারের প্রকাশনা সুলতান গাজী সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীর জীবন ও কর্ম প্রকাশ হচ্ছে বলে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থটির প্রকাশক দারুল উলুম লাইব্রেরীর মালিক জনাব মাওলানা শহীদুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ জানাই। এ পান্ডুলিপি তৈরীতে যাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহযোগিতা নিয়েছি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র জনাব আসকার ইবনে শাইখ বিশিষ্ট নাট্যকার হিসেবে যিনি বাংলার জনগণের কাছে অতি পরিচিত তার রচনা 'ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত' থেকে খুব বেশি সহযোগিতা নিয়েছি বলে ঋণ স্বীকার করছি। পরিশেষে বিশিষ্ট ব্যাংকার, সাবেক সচিব, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান জনাব শাহ আব্দুল হান্নান স্যার এবং তাঁরই একান্ত স্নেহের ওমর বিশ্বাস ভাইয়ের প্রেরনায় এবং আমার জীবন সঙ্গিনী আয়িশা সিদ্দীকার ধৈর্য্যে আমার এ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে বলে তাঁদের সকলের জন্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

সুলতান গাজী সালাহ্উদ্দীনের নিরলস সংগ্রামী জীবন আমাদের জন্যে চলার পথের প্রেরণা হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। এগ্রন্থকে শুদ্ধ করার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি পাঠকের চোখে ধরা পড়ে তাহলে আমাদের জানালে পরবর্তি সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

আবু তালহা আনসারী

জন্ম, বংশ পরিচয়, উত্থান ও ব্যক্তিত্বের পরিচয়

বিশ্বে এমন কিছু প্রতিভাবান মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের জীবনের গৌরবময় অধ্যায় ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে আছে। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। মধ্যযুগীয় ইতিহাসে ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে যখন পশ্চিম এশিয়া হতে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, ঠিক তখনি সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী তার অসাধারণ প্রতিভা ও দূরদর্শিতাবলে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তিকে সমুন্নত রাখেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার জন্য অনেকে তাকে খলীফা হারুনুর-রশিদের সাথে তুলনা করেন।

বংশ তালিকা ও শাসকবর্গ

নবীজির (সাঃ) প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি খোলাফায়ে রাশেদার মত আদর্শ অনুসরণীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠে। সমাজে শান্তির সু বাতাস বইতে থাকে। দীর্ঘ দিনের অত্যাচার ও নির্যাতনের পথ বন্ধ হয়। জনগণ পায় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

কিন্তু যখন রাষ্ট্র শক্তি উমাইয়াদের হাতে আসল (৬৬১-৭৫০) প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র। যা ইসলামে অনুমোদিত নয়।

আঞ্চলিক শাসন কর্তাদের উচ্চাভিলাষ ও রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে ওঠে। এসব শাসনকর্তা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদেরকে মুসলিম জাহানের ‘খলীফা’ বলে দাবি করাটা বিজ্ঞজনোচিত মনে না করে ‘সুলতান’ বলেই নিজেদেরকে অভিহিত করতে লাগলেন। ইবনে খালদূনের মতে, কোন রাজবংশের যোগ্য শাসনকাল সাধারণত একশ বছরের বেশি স্থায়ী হয় না। প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী উমাইয়া খেলাফতের মত আব্বাসীয় খেলাফতের বেলাতেও একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় পাঁচশ বছর ব্যাপী আব্বাসীয় খেলাফত প্রকৃত পক্ষে একশ বছরের মত সময় গৌরবের সঙ্গে শাসন কার্য চালিয়েছে। ৮৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই খলীফারা প্রকৃত ক্ষমতা হারাতে আরম্ভ করেন। এই

অধঃপতন কালে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফতেরও সৃষ্টি হয়- মিসরে ফাতেমীয় খেলাফত, এবং স্পেনে উমাইয়া খেলাফত। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ দু'টি খেলাফতও ছিল বংশানক্রমিক রাজতন্ত্র।

রাজধানী বাগদাদ ভিত্তিক সুন্নী আব্বাসীয় খেলাফতের বিরোধী মিসরে শিয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাঈদ ইবনে হুসাইন। তিনি ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী উপাধি গ্রহণ করে মসনদে আরোহণ করেন। এ বংশেও আল মনসুরের মত যোগ্য খলীফার অভাব ছিল না। কিন্তু প্রায় উম্মাদ খলীফা আল হাকিমের মৃত্যুর পর অযোগ্য খলীফাদের আবির্ভাব ঘটে। এমনি অবস্থায় ১১৭১ খৃস্টাব্দে গাজী সালাহউদ্দিনের অভ্যুদয় মুসলিম শক্তির গুণিত পরিবর্তন সাধিত হয়। ইতোমধ্যে ১০৯৬ খৃস্টাব্দে খৃস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে অবতীর্ণ হয় এবং একের পর এক যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটেই মিসরে প্রথমে নূরুদ্দিন জঙ্গী এবং পরে ১১৭৪ খৃস্টাব্দে সালাহউদ্দিন আইয়ূবীর অভ্যুদয় ঘটে।

ফাতেমীয় খেলাফত

(৯০৯-১১৭১ খৃঃ) রাজধানী বাগদাদ ভিত্তিক সুন্নী

(১) ওবায় দুল্লাহ আল মাহদী ঃ ৯০৯-৯৩৪ খৃস্টাব্দ;
(২) আল কাইম ঃ ৯৩৪-৯৪৬ খৃস্টাব্দ;
(৩) আল মনসুর ঃ ৯৪৬-৯৫৩ খৃস্টাব্দ;
(৪) আল মুইজ ঃ ৯৫২-৯৭৫ খৃস্টাব্দ;
(৫) আল আযীয ঃ ৯৭৫-৯৯৬ খৃস্টাব্দ;
(৬) আল হাকিম ঃ ৯৯৬-১০২১ খৃস্টাব্দ;
(৭) আল যাহির ঃ ১০২১-১০৩৬ খৃস্টাব্দ;
(৮) আল মুসতানসির ঃ ১০৩৬-১০৩৬খৃস্টাব্দ;
(৯) আল মুসতালি ঃ১০৯৫-১১০১ খৃস্টাব্দ;
(১০) আল আমীর ঃ ১১০১-১১৩০ খৃস্টাব্দ;
(১১) আল হাকিম ঃ ১১৩০-১১৪৯ খৃস্টাব্দ;

(১২) আল যাফির ঃ ১১৪৯-১১৫৪ খৃস্টাব্দ;
(১৩) আল ফয়েয ঃ ১১৫৪-১১৬০ খৃস্টাব্দ;
(১৪)আল আদিদ ঃ ১১৬০-১১৭৪ খৃস্টাব্দ;
* সালাহউদ্দিন ইউসুফ ঃ ১১৭৪-১১৯৩ খৃস্টাব্দ;
* সালাহউদ্দিনের ৩ পুত্র
রাজ্যের ৩ অংশ রাজত্ব করেন ঃ ১১৯৩-১১৯৬খৃস্টাব্দ;
* মালিক আদিল ঃ ১১৯৬-১২১৮ খৃস্টাব্দ;
* আল কামিল ঃ ১২১৮-১২৩৮ খৃস্টাব্দ;
* আল আদিল (২য়) ঃ ১২৩৮-১২৪৪খৃস্টাব্দ;
* আস সালিহ ঃ ১২৪৪-? খৃস্টাব্দ;
* তুরান শাহ ঃ ?-১২৫০ খৃস্টাব্দ;

সালাহউদ্দীনের পরিচয় ও উত্থান

গাজী সালাউদ্দীন টাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত তাকরিত নামক স্থানে ১১৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নাম ঃ আল মালিকুন নাসির আবুল মুজাফফর ইউসুফ ইবনে আইয়ূব। পশ্চিমারা তাকে সালাহদিন বলে ডাকে। তাঁর পিতা নাজিমুদ্দীন আইয়ূব-এর নামানুসারে তার প্রতিষ্ঠিত বংশ আইয়ূবী বংশ নামে পরিচিত। তার পিতা নাজিমুদ্দীন আইয়ূব ১১৩৯ সালে ইমাম উদ্দীন জঙ্গী কর্তৃক লেবাননে অবস্থিত বালকাক দুর্গের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১১৬৭ সালে মিসরে এক ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দিলে ফাতেমীয় আল আজিজ নূরুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নূরুদ্দীন তার সাহায্যকল্পে সালাহউদ্দীনের চাচা শিরকুনের নেতৃত্বে তথায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। শিরকুন অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিসরের বিদ্রোহ দমন করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তার কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে আল-আজিজ তাঁকে মিসরের প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে তার মৃত্যু হলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীন খলীফা আজিজের উজির নিযুক্ত হন।

স্বাধীন আইয়ূবী বংশের প্রতিষ্ঠা ঃ ১১৭১ সালে খলীফা আজিজের মৃত্যু হলে সালাহউদ্দীন সমস্ত মিসরকে তাঁর প্রভু নূরুদ্দীন জঙ্গীর অধীনে আনয়ন করেন ও ফাতেমীয় খলীফাদের পরিবর্তে কোন ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে ইসলামী খুৎবার রীতি প্রবর্তন করেন। ১১৭৪ সালে নূরুদ্দীনের মৃত্যুর পর জঙ্গীবংশ লুপ্ত হয়ে গেলে সালাহউদ্দীন স্বাধীন সুলতানরূপে মিসরের সিংহাসন পরিচালনা করেন। আব্বাসীয় খলীফা মুসতাজিরের নিকট থেকে এই উদ্দেশ্যে একটি সনদও লাভ করেন। সালাহউদ্দিন স্বাধীন আইয়ূবী বংশ প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত সিরিয়া, ইরাক এবং আরবে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন।

ক্রুসেডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার সময়কাল থেকেই খৃস্ট-দুনিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাভাবে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। হযরত নবী করীমের (সাঃ) জীবনের শেষ যুদ্ধযাত্রা ছিল তাবুক অভিযান। আরবের উত্তর সীমান্ত সংলগ্ন আগ্রাসী খৃস্টানদের মোকাবেলায় ছিল এই যুদ্ধাভিযান। অতঃপর ইসলামের বীর মোজাহিদগণ পর্যায়ক্রমে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক এবং মিসরের বিস্তৃত অঞ্চল থেকে খৃস্টানদের বের করে দেয়। এই বিষয়টি খৃস্টজগৎ খুব সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এরা আব্বাসীয় খেলাফতের প্রাথমিক যুগে পূর্ব ও উত্তর সীমান্তে পর পর কয়েকটি হামলা করে। কিন্তু প্রতিটি হামলাই নিতান্ত সফলতার সাথে প্রতিহত করা হয়। এই ঘটনাবলীর অণ্যুন্য তিনশ বছর পর আব্বাসীয় খেলাফতে দুর্বলতা, স্থানে স্থানে ছোট ছোট মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং এসবের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে এরা সর্বপ্রথম ৪৭৮ হিজরীতে স্পেনের বিখ্যাত নগরী 'টলেডো' ও এর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি শহর দখল করে নেয়। অতঃপর হিজরী ৪৭৮ সালে সিলি দ্বীপ দখল করে দুটি অঞ্চল থেকেই মুসলমানদের পরিপূর্ণরূপে বের করে দেয়। একই ধারাবাহিকতায় আফ্রিকার কয়েকটি জনপদ থেকেও মুসলমানগণ বিতাড়িত হন। এভাবে আগ্রাসী খৃস্টানরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং ৪৯১ খৃস্টাব্দে তদ্দানীন্তন মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিচিত শাম অঞ্চলে অতর্কিত হামলা করে এন্তাকিয়া নামক একটি বিখ্যাত শহর দখল করে নেয়। ইতিহাসবিদ

ইবনুল আসীর আল-জাযারীর মতে তখনকার মিসরের শিয়া শাসকগণই এন্তাকিয়া এবং তৎপর বাইতুল-মোকাদ্দাসে হামলা পরিচালনার জন্য খৃস্টানদের প্ররোচিত করেছিল। এন্তাকিয়া মুসলমানদের হাত থেকে চলে যাওয়ার ঘটনাটি ছিল খুবই দুঃখজনক। মুসলমানগণ প্রথমে "মারজেওয়াবেক এবং পরে মাআররাতুন-নোমান নামক স্থানে দুটি প্রতিরোধ যুদ্ধের অবতারণা করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। দুটি যুদ্ধেই হাজার হাজার ওলামা-মাশায়েখসহ অগণিত লোক নিহত হন। বন্দি হয় অগণিত নারী পুরুষ! দুটি যুদ্ধই পরিচালিত হয়েছিল ইউরোপীয় খৃস্টানদের নেতৃত্বে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের নামে। এখান থেকেই ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা হয় যা পর্যায়ক্রমে প্রায় তিনশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। পাশ্চাত্যের এই ভয়ংকর আগ্রাসী শক্তিই হিজরী ৪৯২ সনে বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে। দীর্ঘ অবরোধের পর এই বছরই ২৭ শাবান তারিখে বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। "মসজিদুল-আকসা" সহ পবিত্র শহরটি ব্যাপকভাবে লুণ্ঠিত হয়। ব্যাপক গণহত্যার শিকার হয় শহরের বাসিন্দাগণ। ইতিহাসবিদ ইবনুল আসীরের মতে শহরের প্রায় সকল অধিবাসীই হিংস্র খৃস্টানদের দ্বারা নিহত হয়। অতঃপর খৃস্টানরা এন্তাকিয়া, রোহা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস নামক তিনটি ছোট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় পঞ্চাশ বছর মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে ব্যাপক গণহত্যা অব্যাহত রাখে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নূরুদ্দীন জঙ্গী নামক একজন ধর্মপ্রাণ সৎ শাসকের আবির্ভাব ঘটে এবং ক্রুসেড বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে হিজরী ৫৪২ সনে শামের গুরুত্বপূর্ণ শহর রোহা উদ্ধার করেন। সুলতান নূরুদ্দীনের এই সাফল্য রোসক এবং পূর্বাঞ্চলীয় খৃস্টানদের মেরুদণ্ড অনেকটা ভেঙ্গে পড়ে। ওরা তখন পোপের বরাবরে ইউরোপীয় খৃস্টানদেরকে উদ্বুদ্ধ করে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড পরিচালনা করার জন্য আবেদন করে। ফলে জার্মানি, অস্ট্রিলিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালি সংঘবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনের দিকে অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুইস। মোট কথা শুরু পর্তুগাল ছাড়া সমগ্র ইউরোপ সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে ছুঠে আসে। কিন্তু আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তখন ধর্মপ্রাণ নেতৃত্বের আবির্ভাবের ফলে এই বিরাট শক্তিও তাদের সামনে টিকতে

পারেনি। মুসলিম মজাহিদগণ এই সম্মিলিত বাহিনীকে ভেড়ার পালের ন্যায় তাড়িয়ে ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

৫৬৯ খৃস্টাব্দে সুলতান নূরুদ্দীনের ইন্তেকালের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দিন আইয়ূবী সুলতানের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর অসাধারণ বীরত্বের ফলেই হিজরী ৫৮৩ সনে বাইতুল-মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। এর অত্যল্পকাল পরেই মহাবীর সুলতান সালাহউদ্দীন ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পরও আরো বহুকাল যাবত ইউরোপের সম্মিলিত শক্তি মুসলিম দেশগুলির উপর পর্যায়ক্রমে হামলা চালাতে থাকে। কিন্তু সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী এবং সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর নেতৃত্বে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে পুনর্জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলেই মুসলমানদের রাষ্ট্রক্ষমতা আল্লাহর রহমতে পরবর্তী কয়েক শ বছরের জন্য নিরাপদ হয়ে যায়। বিশেষতঃ ইউরোপীয় ক্রুসেডার বা ধর্মযোদ্ধাদের স্পর্ধা চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল আসীর এবং সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খাল্লেকানের মতে পর্যুদস্ত ও হতাশাগ্রস্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সে সময়কার ওলামা ও মাশায়েখগণ যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলশ্রুতিতেই মুসলিম উম্মাহ পূনরুজ্জীবন লাভ করে এবং ইউরোপীয় খৃস্টানরা আগ্রাসনের হিম্মত কয়েক শতাব্দীর জন্য হারিয়ে ফেলে, সংক্ষেপে এটিই হচ্ছে ক্রুসেডের ইতিহাস।

ইউরোপীয় খৃস্টানদের রক্ত লোলুপ চক্ষু ক্রুসেডে পরাজয় বরণের পরও শীতল হয়নি। আসুন! এখানে ক্রুসেডের সার কথা জেনে নেই।

ক্রুসেডের সার কথা

ক্রুসেডের সংজ্ঞা ঃ ১০৯৫ সালের শেষ দিক থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে ১০৯৬সালের প্রথম দিকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় দুইশ বছর ধরে সংঘটিত আফ্রো এশীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খৃস্টানদের যে দানবিক ধ্বংসোল্লাস, অন্য কথায় প্রাচ্যের মুসলিমদের প্রতি প্রতীচ্যের খৃস্টানদের সীমাহীন ঘৃণা বিদ্বেষ ও ইসলাম অনুসারীদের নির্মূল করার উদগ্র বাসনার প্রকাশ রূপে যে উন্মুক্ত রক্ত খেলা, তাই ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত।

রোমীয় খৃস্টান ধর্মরাজ্যের অধিকর্তা মহামান্য পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বান ও নির্দেশে সাড়াদানকারী ইউরোপের তদানীন্তন রাজন্যবর্গ কর্তৃক সংঘটিত অর্বাচীন বর্বর অশিক্ষিত (গীবন ব্যবহৃত শব্দমালা) লোকদের বাহিনী দ্বারা আবদ্ধ এই ধর্মযুদ্ধের ছিল তিনটি পর্যায়ঃ প্রথম পর্যায়ের বিস্তৃত কাল ১০৯৬ থেকে আরম্ভ করে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিস্তৃতিকাল ১১৪৪ থেকে ১১৯৩ সাল পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায় ১১৯৩ থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

বার্ণিজ্যক রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি ধর্মীয় মনস্তাত্ত্বিক কারণে সংঘটিত এই প্রায় দুইশ' বছরব্যাপী যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ১২৯১ সালে তার আপাত ইতি ঘটলেও সেই রক্ত খেলার রেশ চলতে থাকে বহু শতাব্দী ধরে, এমন কি আমাদের মতে আজ পর্যন্তও। আদর্শচ্যুতির মাধ্যমে দুর্বল ও দিকভ্রান্ত হলো যখন মুসলিম উম্মাহ্, তখনই অমুসলিমদের দিক থেকে এল ক্রুসেডের বিপর্যয় অর্থাৎ, এই পরিস্থিতিটাই ছিল ক্রুসেড বিপর্যয় ঘটাবার উপযুক্ত সময়। ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জিহাদের মাধ্যমে এ বিপর্যয় মুসলিম শক্তি কাটিয়ে উঠেছিল অনেক রক্তের বিনিময়ে। বিজয়ী হয়েছিল মুসলিম শক্তি। কিন্তু তার পরেও বিজয়ী সে শক্তি নতুন দিনের নব জীবনের পথে এগিয়ে গেলো না। সে পথে এগিয়ে গেলো বিজিত খৃস্টান শক্তি। ফলে, কালের এবং অযোগ্যতার বিধানেই যেন সেদিনের বিজয়ীরা পরবর্তীতে বিজিতের অবস্থান গ্রহণ করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তুর্কি সাম্রাজ্য। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত হলো ইসরাইল রাষ্ট্র। বিশ্বযুদ্ধ হলো প্রধানত খৃস্টানদের মধ্যে, কিন্তু খৃস্টান সেনাপতিরা বিজয়ের উন্মাদনায় ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায়ে জেরুজালেম বিজেতা সুলতান সালাহউদ্দীনের কবরে পদাঘাত করে বলে উঠল-"রে সালাহউদ্দীন! আমরা এসে পড়েছি। আমরা সিরিয়া জয় করেছি। উঠে দেখ।" প্রায় সোয়া ছয়শ' বছর আগে জেরুজালেম হারানোর যে অপমান জ্বালা তার প্রতিশোধ সোয়া ছয়শ' বছর পর। তাও পরম শ্রদ্ধেয় এক গাজীর কবরে পদাঘাত করে? দুর্বল পতিত অবস্থায় এমনটিই হয়। মুসলিম শক্তি যে তখন দুর্বল পতিত।

অথচ ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে ইসলামের কত না গৌরবময় অবদানের কথা। প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার রোমান সাম্রাজ্যের বিষাদময় ধ্বংসের নীচে প্রায় কবরস্থ ও খৃস্টান

কুসংস্কারের অন্ধকারে হারিয়ে গেলো যখন, তখনই "The message of hope and salvation came from the caraven traders of Arabia who stood outside the corrupting atmosphere of decomposed Roman world, and prospered by their advantageous position. The "Revolt of Islam" saved humanity.

আশা ও মুক্তির বার্তা এল আরবের সেই মরু বাণিজ্যযাত্রীদের কাছ থেকেই যারা অবস্থান করছিল রোমক জগতের গলিত পুতিগন্ধময় দূষিত আবহাওয়ার বাইরে, আর সমৃদ্ধি অর্জন করছিল নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগে। সেই ইসলামের বিপ্লবই বাঁচিয়ে দিল মানবতাকে।" অতঃপর কালক্রমে আদর্শচ্যুতির পথ পরিক্রমায় ইসলামের গৌরব সূর্য হলো অস্তাচলগামী। বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত যখন বিলাসে দুর্বল ও নড়বড়ে আর মুসলিম প্রাচ্যের শাসক শক্তি যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তখনই তার বিরুদ্ধে আরম্ভ হলো খৃস্টান প্রতীচ্যের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। পরবর্তী ক্রুসেড এর কাল পেরিয়ে তুর্কি খেলাফত যখন মৃতপ্রায় তখনই এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সে বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি খেলাফত ছিল পরাজিতদের সঙ্গে জোটবদ্ধ এবং তাই পরাজিত। তার অবস্থা হলো আরও পতিত। মুসলিম প্রাচ্যের সেই পতিত অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তার জোয়ার বইয়ে দিয়ে বিশ্বযুদ্ধজয়ীদের নির্দেশে গঠন করা হলো বিভিন্ন রাজ্য-শেখদের বাদশাহদের। সেসব রাজ্য নিয়ে রাজনৈতিক খেলার ফলাফল সকলেরই জানা। ক্রমে মুসলিম উম্মাহ্ তলিয়ে গেলো পতনের আরও অতলে। আজ পর্যন্ত জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা মুসলিম সমাজ এখনও ক্রুসেড বিপর্যয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। বরং সে বিপর্যয় আজ সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিচ্ছে বা দিয়েছে। এবং একাধিক শক্তিই এখন মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে এ বিপর্যয়ের সংঘটনকারী। বাগাড়ম্বরপূর্ণ অর্থহীন তেজ প্রকাশ্যের মধ্য দিয়ে নয়, ইসলামের মানবতাবাদকে ধ্রুব লক্ষ্যে রেখে তেজকে সংহত করে মুসলিম উম্মাহকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে মেধা গুণ সমন্বিত উপযুক্ত শক্তি অর্জন করতে হবে যা দিয়ে অমুসলিমদের সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত ঘৃণা বিদ্বেষপুষ্ট অকল্যাণের সকল শক্তির মোকাবিলা করা যায়। বর্তমান দুনিয়ায় যা ঘটছে তার থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও মানবতার দাবীদার অনেক অমুসলিম শক্তিই আজ ধর্মীয় কারণেই ইসলাম অনুসারীদের উপর খড়গহস্ত। পরম সাম্প্রদায়িক মগজে তাদের ধূর্ত প্রখর চাণক্য বুদ্ধি, হাতে অর্থবিত্তের থলে, ঝুলিতে পারমাণবিক মারণাস্ত্র এবং মুখে গণতন্ত্রের হরিনাম কীর্তন।

এখানে স্মরণীয় "যে, ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করেছে।" ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও শিক্ষাবিহীন ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার অনেক উপকরণ প্রবেশ লাভ করে। মুসলমানদের উন্নত মানের কৃষ্টি সংস্কৃতির অবদানের উপর ভিত্তি করেই ইউরোপে এসে যায় রেনেসাঁ বা নব জাগরণ। যে নব জাগরণের জোয়ারে নতুন দিনে প্রবেশ করতে পারত মুসলিম উম্মাহ্ সেই জোয়ারে স্নাত হয়ে ক্রুসেড বিজিত ইউরোপে উন্নত জীবনের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে দিগান্তরে। পনের শতকের শেষ দিকে তাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হলো প্রাচুর্যপূর্ণ নতুন মহাদেশ আমেরিকা, আবিষ্কৃত হলো নতুন নতুন বাণিজ্য পথ। ভাস্কো-ডা-গামার অস্ত্রসজ্জিত বাণিজ্যপোত স্পর্শ করল ভারতবর্ষের মাটি। হিংসায় উন্মুক্ত ভাস্কো-ডা-গামা আলমিদা আলবুকার্ক শুধুমাত্র ভারত মহাসাগরে ক্রুসেড বিজিতদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত করল না, মুসলিম মুঘলদের শক্তিকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে এ উপমহাদেশে "ততদিনে বিজিত ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিকেও" পেয়ে গেলো তাদের সাহায্যকারী হিসাবে।

অতঃপর যথাসময়ে ভারতবর্ষের বুক থেকে উৎখাত হলো মুসলিম মুঘল শক্তি। ক্রমে ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুপ্রাণিত শিবাজী স্বপ্ন বাস্তবতার পরশ পেলো ভারতবর্ষের বুকে। প্রতিষ্ঠিত হলো ভারত ও পাকিস্তান। তারপর ১৯৭১ সালের ১৬ডিসেম্বরে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তারও পরে সামাজতান্ত্রিক শক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয় এবং বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন নববিন্যাস লগ্নের ট্রানজিশন কাল। এই কালে মুসলিম বিশ্বের নানা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যা যা ঘটেছে, তাতে একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও বিস্মিত ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি সেই মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার বর্বরতম সর্বনাশা প্রয়োগ। সে প্রয়োগ এতই স্পষ্ট ও প্রকট যে ঘটনাবলীর স্বরূপ যে কোন বিবেকবান ব্যক্তিকে চরম আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দেবেই। বসনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীরসহ ভারতের অযোধ্যা, গুজরাট বোম্বাই এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে যা সংঘটিত হচ্ছে তাকে নবতম পর্যায়ের ক্রুসেড বলা ছাড়া আর কি বলা যায়? এবং ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধই যদি বলতে হয় তাহলে এ-ও বলতে হবে যে উপরোক্ত রাষ্ট্রসমূহের মুসলমান অধিবাসীদের উপর প্রধানত ধর্মীয় কারণেই খড়গহস্ত হয়েছে ইউরোপের খৃস্টান শক্তি, মধ্য প্রাচ্যের ইহুদী শক্তি এবং ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। সিরিয়া ছিলো গাজী সালাহউদ্দীনের প্রিয় জায়গা। আর দামেশক শহরকেও তিনি ভালোবাসতেন। ২২৯৩ সালের ৪ঠা মার্চ (৫৮৯

হিজরীতে) ইন্তেকালের পর তাকে প্রথমে দামেশক দুর্গের অভ্যন্তরে দাফন করা হয়। ১১95 সালে উমাইয়া মসজিদের উত্তরে তার স্থায়ী কবরের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্ব প্রেক্ষাপট

খৃস্টান ও ইহুদীরা মুসলমানদের চির শত্রু। সুযোগ পেলেই তারা মরণ কামড় দিতে ভুল করে না। পূর্ব জমানা থেকে আজ পর্যন্ত তারা সর্বদা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানরাও বসে থাকেনি। যুগে যুগে তারা দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ক্রুসেডের অর্থ ধর্মযুদ্ধ হলেও ১০৯৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত চলমান ক্রুসেডগুলো কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা কিংবা রক্ষার জন্য সংঘটিত কোন যুদ্ধক্রম ছিল না। তা ছিল ভৌগোলিক ও ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম ও খৃস্টান বলে চিহ্নিত দু'টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একের বিরুদ্ধে অন্যের, প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সীমাহীন ঘৃণা-বিদ্বেষ ও নির্মূল করে দেয়ার তীব্র বাসনার প্রকাশরূপে এক উন্মুক্ত রক্ত-খেলা, আফ্রো-এশীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খৃস্টানদের এক দানবীয় ধ্বংসোল্লাস, বৃহত্তরভাবে প্রাচ্যের বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের এক নির্মম মোকাবিলা।

কেন সংঘটিত হয়েছিল এসব ভয়ঙ্কর ক্রুসেড যার মাধ্যমে অগণিত আদম সন্তানের অসহায় রক্ত-খেলায় রচিত হলো মানবেতিহাসের এক চরম কলঙ্ক-কাহিনী?

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক হিট্টির কথায়, "ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খৃস্টান ইউরোপের তীব্র প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ'। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গীবনের মতে, "খৃস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করে"।

মুসলিম প্রাচ্যের এমন কি কর্মকাণ্ড খৃস্টান ইউরোপের উপর বিরূপ 'ক্রিয়া' সৃষ্টি করেছিল যা, 'তীব্র প্রতিক্রিয়া' রূপে সংঘটিত হলো এই ধ্বংসলীলা? রোমীয় ধর্ম-রাজ্যের অধিকর্তা পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহবানে সাড়াদানকারী ইউরোপের তদানীন্তন যেসব রাজন্যবর্গ কর্তৃক সংগঠিত 'অর্বাচীন-বর্বর-অশিক্ষিত' লোকদের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রাচ্যের

উপর, তাঁরাও কি ছিলেন অর্বাচীন-বর্বর-অশিক্ষিত? আক্ষরিক অর্থে তা তো সত্য নয়! তাহলে?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে দু'টি পক্ষেরই ক্রুসেড-পূর্বকালীন সার্বিক অবস্থা, অন্য কথায়, ক্রুসেডের পেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পূর্ব অবস্থা

হেলেনীয় যুগে এরিস্টটলের ভাবশিষ্য আলেকজাণ্ডার গুরুর মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন এক বিশাল সাম্রাজ্য। সে সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল গ্রীস, আলতোনিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিসর, পারস্য এবং সিন্ধু অববাহিকার বিরাট এলাকা পর্যন্ত। এই যুগে গ্রীক ভাষা লাভ করে এক আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং মিসরে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত নগরী আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে ওঠে সুবিখ্যাত এক বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। বাণিজ্যিক এলাকা ভূমধ্যসাগরে আর সীমাবদ্ধ না থেকে তা বিস্তৃত হয় মধ্য ইউরোপ থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং আটলান্টিক উপকূল ও চীন পর্যন্ত। কিন্তু অচিরেই ঘনিয়ে আসে গ্রীকদের পতনকাল।

ম্যাসিডোনীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে দরিদ্র, বেকার, অসন্তুষ্ট জনসাধারণ ও দাসদের বিপ্লবী আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অনেক স্থানেই বিদ্রোহীরা ধনী ভূস্বামীদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়। এ অবস্থায় দাস মালিকেরা রোমানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। রোমানরা ইতিপূর্বেই খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গ্রীসও কতক গ্রীক রাজ্য দখল করে নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। গোড়া থেকে দাস-ব্যবস্থার উপরই নির্মিত হয়েছিল এই রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি। রোমানরা ছিল অভিজাতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সিনেট শাসিত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। এদিকে গ্রীক আমল থেকে চলে আসা অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা রোমান আমলেও চলতে থাকে। এই মন্দাবস্থা কাটতে আরম্ভ করে তাদের দেশ জয়ের মাধ্যমে। ক্রমে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, কার্থেজের রাজ্যসমূহ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিসর। তবুও খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধে রোমান অভিজাতদের মধ্যে দেখা দেয় গৃহবিবাদ। ফলে, সিনেটীয় প্রজাতন্ত্র রূপান্তরিত হয়ে সে স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্রেরই অনুরূপ এক শাসন।

গৃহবিবাদ থেকে উদ্ভূত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, অতঃপর বংশানুক্রমিক শাসন, আবার গৃহযুদ্ধ এবং অবশেষে গথ, হুন, ভ্যাণ্ডাল, মঙ্গোল প্রভৃতি 'বর্বর' জাতিসমূহের আক্রমণে নড়বড়ে হয়ে যায় রোমান সাম্রাজ্যের ভিত।

এমনি অবস্থায় সাম্রাজ্যে রোমান আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করা হয়, তাতে করে গড়ে উঠে প্রথমে ছোট বড় চারটি রাজধানী এবং পরে কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত বেশ ক'টি রাজ্যাংশ। দু'ভাগে বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে ও পূর্বাংশে একজন করে 'অগাস্টাস' বলে অভিহিত অধিকর্তা এবং তাঁদের অধীনে প্রতি অংশে একটি করে দু'টি ছোট রাজধানীতে 'সিযার' নামে অভিহিত দু'জন শাসনকর্তা। এড্রিয়াটিক সাগরের পশ্চিমের জনপদ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। রাভেন্না প্রকৃত প্রস্তাবে তার প্রশাসনিক হলেও রোমই থাকে তার রাজধানী।

আর এ ব্যবস্থারই সূত্র ধরে গড়ে উঠা রাজ্যাংশগুলোতে অধিষ্ঠিত হয় কাউন্ট-ডিউক-ব্যারন ইত্যাদি শব্দে অভিহিত স্থানীয় শাসকবর্গ। অতঃপর কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাংশ নিয়ে এক সময় গড়ে ওঠে কয়েকটি বড় বড় এলাকা, ক্রমে সেগুলো পরিণত হয় বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি স্ব-শাসিত রাজ্যে। এসব রাজ্য নিয়েই চিহ্নিত হয় পশ্চিম রোমান এলাকা বা সত্যিকারের প্রতীচ্য; এবং পূর্বাংশের এলাকা পরে পরিচতি হয় বাইজানটাইন সাম্রাজ্য নামে, কনস্টান্টিনোপল হয় যার রাজধানী। বলকান ও এশিয়া মাইনরের জনপদসমূহ নিয়ে গড়ে ওঠে এই সাম্রাজ্য। ৩৩৫ খৃস্টাব্দে রাজা কনস্টাটাইন দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পূর্বে রোমান বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যও অন্তর্বিরোধ ও আত্মকলহে হয়ে পড়ে অন্তঃসারশূন্য। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অধিকর্তাদের দৃষ্টিতে ঐতিহ্যগতভাবেই রোমান সাম্রাজ্যের এই পূর্বাংশ প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত বলেই বিবেচিত হত। এ বিবেচনায় সংযুক্ত ছিল বেশ একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি। গ্রীক বীর যে আলেকজাণ্ডার এক হেলেনিক দুনিয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সিরিয়া-মিসর-ইরান জয় করে ছুটে এসেছিলেন সমরকন্দ-কাবুল হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত, উৎসাহের আতিশয্যে যিনি এশিয়াকে হেলেনিক করে তোলার উদ্দেশ্যে ইরান-কন্যাদের সঙ্গে গ্রীক সৈন্যদের ঢালাও বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে সেই আলেকজাণ্ডারও

চিহ্নিত হয়ে গেলেন এক 'প্রাচ্য বীর' রূপ! ল্যাটিনভাষী প্রতীচ্যের কাছে গ্রীকভাষী আলেকজাণ্ডার পুরাপুরি আপনজন হিসাবে গৃহীত হলেন না।

আপনজন গৃহীত হলেন না পরবর্তী কালের রাজা কনস্ট্যান্টটাইনের মত বিখ্যাত রাজন্যবর্গও।

এদিকে ভোগ-বিলাসে ও আত্ম-কলহে লিপ্ত পশ্চিমাংশের রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক গীবন এই মত ব্যক্ত করে গেছেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যার জন্য বহিঃশত্রুর কোন আক্রমণ ছাড়াই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। এমনি অবস্থায় সে ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে উপরোক্ত 'বর্বর' জাতিগুলোর আক্রমণে। সেটা পঞ্চম শতক। এ আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচল ব্যবস্থা। শহরের লোকসংখ্যা হ্রাস পায় এবং অনেকেই চলে যায় গ্রামাঞ্চলে। উদিত হয় কয়েক শতাব্দীব্যাপী এক তামস যুগ।

এই অবস্থা থেকে সেখানে জন্ম নেয় সামন্ততন্ত্র। "সামন্ত যুগের শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল 'ফিউড' অর্থ্যাৎ, শর্তাধীনে জায়গীর প্রদানকে কেন্দ্র করে। ফিউড থেকেই 'ফিউডাল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ফিউডের পরিবর্তে জায়গীরদার তার প্রভুর 'ভাসাল' বা অনুগত সামন্তে পরিণত হয়। ... প্রভুর স্বার্থ সংরক্ষণ, প্রভুর শত্রুপক্ষীয়দের গোপন ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা উদঘাটন ইত্যাদি তো ছিলই; তা ছাড়া প্রয়োজনের সময়ে প্রভুকে সসৈন্য সাহায্য করা, প্রভুর দুঃসময়ে তাকে আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্য প্রদান করা এগুলোও সামন্তদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল। সামন্তেরা সকলেই যে রাজা বা উচ্চতম প্রভুর কাছ থেকে জায়গীর লাভ করত এমন নয়; হয়ত রাজার কাছ থেকে পেত ডিউক, তার থেকে কাউন্ট, তার থেকে ভাইকাউন্ট, ব্যারন বা নাইট। এভাবে সেকালের ইউরোপ নাইট থেকে ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে রাজা পর্যন্ত বহু বিস্তৃত সামন্ত সম্পর্কের জালে ছেয়ে গিয়েছিল"। এই প্রতীচ্যে তখন ধর্মীয় পরিস্থিতি কেমন ছিল? কনফিউজড, বিভ্রান্তিময়। ধর্মীয় ভাবধারার দিক থেকে গ্রীকদের মত রোমানরাও ছিল প্রকৃত-পূজক। আরাধ্যদের মধ্যে সবার উপরে ছিলেন জুপিটার, তারপর মার্স, ভেস্তা, ভেনাস, মিনার্ভা এবং আরো অনেকে। এই দেব-দেবীরা ছিলেন, এক-একটি শক্তির প্রতীক, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের

জন্য নির্দিষ্ট কল্পিত শক্তির অধিকারী। তদুপরি, কোন কোন পরাক্রান্ত সম্রাটও মৃত্যুর পর পূঁজিত হতেন দেবতারূপে; অবশ্যি সিনেটের অনুমোদনক্রমে। শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে জনসাধারণ নব-নব আরাধ্য আবিষ্কার করলেও রোমান কর্তৃপক্ষ তাতে কোন বাধার সৃষ্টি করতেন না। তাই বলে, সেই আবিষ্কার অনুমোদনযোগ্য ছিল না। কারণ, ৬৪ খৃস্টাব্দে ইহুদীদের বিদ্রোহ থেকে রোমান কর্তৃপক্ষ লাভ করেছিলেন এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। ফলে, সে ধর্মমতকে পঙ্গু করে দেয়ার উদ্দেশ্যে জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদী মন্দিরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। ইহুদী ধর্মের প্রতি রোমানদের মনোভাব যখন এতটা বিরুপ, তখন খৃস্টধর্মের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন ছিল? একই রকম বিরূপ ছিল তারা খৃস্টানুসারীদের প্রতিও। কারণ, রোমানদের কাছে খৃস্টধর্ম ছিল ইহুদীধর্মেরই একটি শাখা মাত্র। রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদীদের মত খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল সঙ্কটজনক। জান-মালেরও নিরাপত্তা ছিল না তাদের। তবুও সব কিছু সহ্য করে সুকৌশলে প্রচারকার্য চালাতে লাগল তারা। দল তাদের বাড়তে লাগল। এই ধর্মমত সাড়া জাগাতে আরম্ভ করল শিক্ষিতদের মনে। খৃস্টানদের সবিনয় বক্তব্য ছিল-তারা দেশের প্রচলিত আইন মান্যকারী অনুগত নাগরিক, নবজীবনের সন্ধান পেয়েই তারা খৃস্টানুসারী হয়েছে, খুঁজে পেয়েছে জীবনের প্রকৃত শান্তি। কিন্তু দিনের পর দিন দল যখন ভারী হয়ে ওঠে এবং পূর্বোক্ত 'বর্বরদের' আক্রমণ নেমে আসে, তখন তাদের ভুল বদলে যায়। রোমান রাষ্ট্রশক্তির বিপর্যয়জনিত দুরাবস্থার সুযোগে তারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চার্চ নির্মাণের অনুমতি আদায় করে নেয়।

চার্চের উদ্ভব

রোমান সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থায় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবকালে খৃস্টান সমাজের জন্যও সূচিত হয় এক শুভ সময়। সামন্তরা যখন তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, সাংস্কৃতিক ও মানসিক দিক থেকে জনসাধারণ যখন তাদের ট্রাডিশনাল ধর্মীয়বোধ সংরক্ষণের কোন সহায়তাই আর পাচ্ছিল না রোমান প্রভুদের কাছ থেকে, তখন এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণে এগিয়ে আসে খৃস্টান পাদ্রীরা। তাতে করে শুধুমাত্র তাদের দলই ভারী হয় না, চার্চ নির্মাণের অনুমতি বলে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন চার্চ। তাছাড়া, সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওই সময়টাতে চার্চের লোকদেরও ভূস্বামী হওয়ার পথে কোন অন্তরায় ছিল না। আগে থেকেই চার্চের ধনার্জনের পথ ছিল একাধিক। মানুষের পারত্রিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত থাকায় অর্থার্জনের ব্যাপারে যাজকমণ্ডলীর সুযোগ ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। সেই 'অন্যদের' পাপ স্খালনের জন্য চার্চ অর্থের বিনিময়ে তাদের কাছে 'ইনডালজেন্স ও (ইনডালজেন্স মানে স্বর্গপ্রাপ্তির সার্টিফিকেট) বিক্রি করত। এক কথায়, চার্চ হয়ে ওঠে প্রচুর সম্পদের মালিক। এবং ভূস্বামী হওয়ার পথে বাধা না থাকায় চার্চও হয়ে ওঠে সামন্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে চার্চই হয়ে যায় তখনকার ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামন্ত মালিক। জার্মানীতে চার্চ ছিল অর্ধেকেরও বেশি যমির মালিক। সমগ্র ক্যাথলিক জগতের এক-তৃতীয়াংশ যমির মালিক হয়ে ওঠে চার্চ। বিভিন্ন স্তরের চার্চ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন স্তরের সামন্ত। উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, বিভিন্ন স্তরের চার্চের প্রশাসনিক সম্পর্কের মাধ্যমে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে এক যাজক শ্রেণী, সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি তারই অনুরূপ এক যাজকতন্ত্র। এ সকল পন্থায় বৈষয়িক উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে চার্চের রাজনৈতিক প্রভাব। চার্চ রাজার কাছ থেকে লাভ করে শুল্ক আদায় ও বিচার-আচারের ক্ষমতা। রোমের ধর্মযাজক, যাঁকে বলা হত পোপ, তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে শক্তিশালী। ফ্র্যাঙ্কদের সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ পোপ লাভ করেন সমগ্র মধ্য-ইটালির যমিদারী। অতঃপর রোমে রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে মহামান্য পোপ তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে 'হোলি রোমান এম্পায়ার' বলে ঘোষণা করেন। এভাবে চার্চ ও রাষ্ট্র শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্ষমতা ও অধিকারের সীমা নিয়ে এ দুই

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্বও দেখা দেয় অচিরেই। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সংগ্রামের পর চার্চই জয়লাভ করে এবং সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হয় চার্চের নিরঙ্কুশ প্রভাব।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে চার্চের প্রভাব

সে যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বলতে যা কিছু ছিল, তার উৎসস্থল ছিল চার্চ। ধর্মমত প্রচারের জন্য যাজকদেরও কিছু লেখাপড়া শিখতে হত। মুদ্রিত বইপত্রের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তখন শিক্ষাদান করা হত প্রধানত বিতর্ক ও বক্তৃতার মাধ্যমে, আর ধর্মীয় ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। তাই বলতে হয়, সাম্রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রায়-অশিক্ষিত ও অনুন্নত এমনি এক মধ্যযুগীয় প্রতীচ্য সমাজের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রতিটি রাজ্যের সামন্ত-নির্ভর শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা, যাঁর সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি পেত সামন্তদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট ছোট সেনাদলের সমন্বয়ে। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি যাজকতন্ত্র ছিল একক শক্তিশালী ধারক। সব ক'টি রাজ্যের আর্চবিশপ বিশপদের নিয়ে সমগ্র প্রতীচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী একক অধিকর্তা ছিলেন রোমের মহামান্য পোপ। ক্রুসেড-পূর্বকালীন ইউরোপে এই-ই ছিল রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অধ্যাত্মিক অবস্থার বিদ্যমান রূপরেখা।

ক্রুসেড-পূর্বকালীন মুসলিম প্রাচ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি

এবার স্বাভাবিক প্রশ্নঃ কেমন ছিল ক্রুসেড পূর্বকালীন মুসলিম প্রাচ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি আর এ পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্টতর অবহিতির জন্যই ইসলাম-পূর্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন।

মানব সভ্যতার ইতিহাস ক্রম-সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বা একই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে নানা জাতির মেধা ও প্রতিভার অবদানে গড়ে ওঠে নিজেদের কৃষ্টি। আর সেসব বিশেষ কৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কোন একটি সভ্যতা। এভাবেই একদা সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় ও কালদীয় কৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সেমেটিক সভ্যতা, ইতিহাসে যা মেসোপোটেমীয় সভ্যতা নামে অভিহিত; গড়ে উঠেছিল মিসরীয় সভ্যতা, গ্রেকোরোমান-বাইজানটাইনীয় তথা হেলেনীয় সভ্যতা এবং ভারতীয় ও চীন সভ্যতাসহ পৃথিবীর আরও আরও সভ্যতা; গড়ে উঠেছিল ইসলামী সভ্যতা। সমন্বয় শুধু কৃষ্টির নয়, সমন্বয় ঘটে সভ্যতারও। হেলেনীয় সভ্যতার সঙ্গে ইসলামী সভ্যতার সমন্বয়ে সূচিত ইউরোপীয় জীবনে নব জাগরণে গড়ে উঠেছিল আধুনিক সভ্যতার ভিত। কালপ্রবাহে মানুষের সভ্যতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া যেন বিভিন্ন ছোট বড় স্রোতধারার সংমিশ্রণে বৃহৎ নদী সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মত। নদীর সাগর-সঙ্গমে মিলিত হওয়ার প্রয়াসের মতই যুগ-যুগান্তরের বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যুগ-যুগান্তরের বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণ-সমন্বয় যেন মহামানবতার পূর্ণতায় মিলিত হওয়ার লক্ষ্যেই মানুষের চিরন্তন প্রয়াস।

কালে কালে বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছে এ প্রয়াস, সম্মুখীন হয়েছে অনেক বিপথগামীতার। যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস রক্তাক্ত হয়েছে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির সংঘর্ষে, এক দেশের বিরুদ্ধে অন্য দেশের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায়। সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রযাত্রা স্তব্ধপ্রায় হয়েছে উচ্চাভিলাষী রক্তপিপাসু দিগ্বিজয়ীর গণহত্যায়। তবুও নীরবে নিভৃতে মানুষের আশা ভোরের প্রত্যাশায় কাটিয়েছে অন্ধকার রাত। আবার এগিয়েছে মহাকালের রথ। সাধারন দৃষ্টিতে মানুষের ইতিহাস পারস্পরিক হানাহানির ইতিহাস, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস, একের উপর অন্যের রক্তক্ষয়ী প্রাধান্য বিস্তারের ইতিহাস। তবুও, রক্তারক্তি হানাহানির মাঝেও

লোকচক্ষুর অন্তরালে রচিত হয়ে চলেছে মানব সভ্যতার পরবর্তী স্তর। এই-ই হচ্ছে ইতিহাসের সত্য।

প্রাগৈতিহাসিক কালের পুরনো প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ পেরিয়ে লৌহ যুগের পথ-পরিক্রমা শেষ করে ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতায় প্রবেশ করল মানুষ। নিজেদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে ক্রমে আবিষ্কৃত হলো লিখন পদ্ধতি; বিকশিত হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণা, দ্রব্য বিনিময় প্রথা এবং ধর্মীয় বোধ; সূচিত হলো কৃষিকাজ, সেচ ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসন; আর তারই সঙ্গে উন্মোচিত হতে আরম্ভ করল শিল্প-স্থাপত্য-শিক্ষা-বিজ্ঞানের চেতনা। সবকিছু মিলে তখন মানব সভ্যতার বিকাশ-লগ্ন। তার স্বাক্ষর মিলেছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায়, নীল ও সিন্দু বেধৌত বিস্তৃত এলাকায়। সেসব স্বাক্ষর বলে দিচ্ছে মেসোপোটেমীয় ও মিসরীয় সভ্যতার কথা, সিন্ধু সভ্যতার কথা।

টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী-বিধৌত এলাকা ছিল খুবই উর্বর। পরবর্তীতে এ এলাকা মেসোপোটেমিয়া বলে অভিহিত হয়। বহু আগে সেখানে গড়ে উঠেছিল সামেরী বা সুমেরী নামে অ-সেমিটিক জাতির এক রাজ্য। খৃস্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আরবের সেমিটিক জাতির একটি শাখা এই এলাকায় এসে সামেরীদের পরাস্ত করে স্থাপন করে নিজেদের রাজ্য। কিন্তু চারশ' বছর পর সে এলাকায় আবার প্রতিষ্ঠিত হয় সামেরী রাজ্য। আরম্ভ হয় নব্য-সামেরীয় যুগ, যে যুগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা দুঙ্গী। তিনিই সে রাজ্যে সর্বপ্রথম প্রচলিত করেন একটি নিষিদ্ধ আইন বা কোড। রাজা দুঙ্গীর মৃত্যুর পর সে রাজ্যের আধিপত্য চলে যায় সেই সেমিটিক জাতির হাতেই। সেমিটিকদের অন্যান্য অংশ এসে উপস্থিত হয় ওই অঞ্চলের আশেপাশে। অভিহিত হয় তারা আমোরাইট ও ইলামাইট নামে। আমোরাইটরা বসতি স্থাপন করে ব্যাবিলন নামক স্থানে, আর ইলামাইটরা মেসোপোটেমিয়ার উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায়। ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে আমোরাইটরা গড়ে তোলে এক রাজ্য। তাদের বিখ্যাত রাজার নাম হাম্মুরাবি। এই অঞ্চলে সামেরীয়রা লিখন পদ্ধতি থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাবস্থাদির সূচনা করে বলে তারা চিহ্নিত হয় সভ্যতার অন্যতম অগ্রদূতরূপে। ইলামাইটরা তাদের অঞ্চলে গড়ে তোলে আক্কাদীয় রাজ্য। কালক্রমে ওই অঞ্চলের সকল জাতির কৃষ্টি-

সমন্বয়েই গড়ে ওঠে মেসোপোটেমীয় সভ্যতা। দুঙ্গীর বিধিবদ্ধ আইন বা কোড এবং পরবর্তীকালে হাম্মুরাবির বিদিবদ্ধ আইন বা কোড এই সভ্যতার কথাই প্রকাশ করে। সমসাময়িককালে মিসরেও গড়ে ওঠে অনুরূপ সভ্যতা। তবে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, আইনভিত্তিক মেসোপোটিমীয় সভ্যতার পাশাপাশি মিসরীয় সভ্যতা ছিল নীতি ও ধর্মীয় বোধভিত্তিক।

সামেরীদের মত মেসোপটেমীয় জাতিগুলোও ছিল প্রকৃতি-পূজক। সামেরীদের মত সূর্যকে মারদুক নামে পূজা করত ব্যাবিলনবাসীরা। প্রধান দেবতা মারদুক ছাড়া তাদের আরও পূজ্য ছিল প্রেমের দেবী ইশতার, বায়ুর দেবতা বারুত্তস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি প্রকাশক দেব-দেবী।

খৃস্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আরবের সেমিটিক জাতির অপর একটি শাখা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে এসে এক রাজ্য গড়ে তোলে এবং সূচনা করে হিব্রু সভ্যতার। হিব্রু ও ইহুদী শব্দ দু'টি সমার্থবোধক হলেও হিব্রু শব্দটি প্রাচীনতর। এখানে স্মরণযোগ্য যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে হযরত দাঊদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ) প্রমুখ নবী রসূলগণের অবদানে হিব্রু সভ্যতা সুমজ্জ্বল। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর পর হিব্রু জাতির অধঃপতন সূচিত হয় এবং তাদের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, উত্তরাংশে ইসরাইলী রাজ্য এবং দক্ষিণাংশ জুডাহ্ রাজ্য। খৃষ্টপূর্ব ৭২২ অব্দের দিকে আসিরীয়দের দ্বারা ইসরাইলী রাজ্য অধিকৃত হয়। অতঃপর হিব্রুগণ বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বলে তাদের অভিহিত করা হয় 'বিলুপ্ত দশটি গোত্র' বলে। অন্যদিকে ৫৮৬ খৃস্টপূর্বাব্দে কালদীয়রা জুডাহ্ রাজ্য অধিকার করে নেয়।

অন্যান্য সেমিটিকদের মত এই হিব্রুরাও ছিল প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। হযরত মূসা (আঃ) তাদের ফিরিয়ে আনেন একক উপাস্য 'জেহোভা'র পথে। কিন্তু পরে আবার তাদের মধ্যে দেখা দেয় স্পষ্ট বিভ্রান্তি। সভ্যতার ক্রমবিকাশে হিব্রুদের অবদান যথেষ্ট। দুঙ্গী হাম্বুরাবির আইনের মত তারাও প্রণয়ন করে 'ডিউটোরোনোমিক কোড' যাতে বিধিবদ্ধ ছিল দাসমুক্তির কথা, ভোজবাজির নিন্দা, সুদগ্রহণে শাস্তির ব্যবস্থার মত বিভিন্ন অনুশাসন। কিন্তু পথভ্রান্ত ইহুদীরা এসব অনুশাসনের কোনটিই পালন করত না।

ওই সময়টায় দেখা যায়ঃ অ-সেমিটিক, সেমিটিক ও আর্য নামে অভিহিত জনগোষ্ঠী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসবাস করছে, রাজ্য গড়ে তুলছে, নিজেদের মেধানুযায়ী কৃষ্টি-সভ্যতা নির্মাণে অবদান রাখছে। ভারতবর্ষেও এসেছিল এমনি এক বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। আর্য বলেই তাদের পরিচয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, আর্যদের আদি বাসস্থান পোল্যান্ড থেকে আরম্ভ করে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশু চারণকারী যোদ্ধা যাযাবর এই জনগোষ্ঠী কালক্রমে জীবন ধারণের প্রয়োজনেই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে চলে আসে পারস্যে অর্থাৎ, বর্তমান ইরানে। ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডির মতে, এই ইরান থেকে তাদের একাংশ এসেছিল ভারতবর্ষে। আর্যদের আগমনকালে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে প্রজ্বলিত ছিল সিন্ধু সভ্যতার দীপশিখা। সেই দীপশিখাই নিভে গিয়েছিল আর্যদের সদর্প হুঙ্কারে। সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের বিপর্যস্ত করে এবং দাসে পরিণত করে একদা যাযাবর যে আর্যরা বসবাস করতে আরম্ভ করল সম্পদে ভরপুর এই ভারতবর্ষে, কালক্রমে তারা এখানে শুধু এক বিশাল সাম্রাজ্যই গড়ে তুলল না, গড়ে তুলল বেদ-উপনিষদভিত্তিক এক সুসমৃদ্ধ কৃষ্টি। আর সিন্ধু সভ্যতার অনেক অবদান নিয়ে এবং তার সঙ্গে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আর্যরা গড়ে তুলল যে সভ্যতা তাকে বলা হয়, আর্য সভ্যতা।

সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ এক সভ্যতা তখন বিদ্যমান ছিল ভারতবর্ষের এই পূর্বাঙ্গলীয় জনপদেও। "প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করত তা ধরে নেয়া যেতে পারে। .... মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়েছিল এবং তারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়। .... আর্যগণের উপনিবেশের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রাচীন অনার্য ভাষা লুপ্ত হল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ জৈন ধর্ম প্রচারিত হলো, বর্ণাশ্রমের নিয়ম অনুসারে সমাজ গঠিত হলো। এক কথায় সভ্যতার দিক দিয়ে বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অংশরূপে পরিণত হলো"। ধর্মীয় দিক থেকে আর্যরাও ছিল তদানীন্তন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অন্যান্য জাতির মতই বিভিন্ন কল্পিত শক্তির উপাসক; সেই সূর্য-চন্দ্র-অগ্নি প্রভৃতির শক্তিতে বিশ্বাসী। সেসব শক্তির পরিতুষ্টির জন্য আর্যরা সেসবের স্তর ও যজ্ঞ করত।

এভাবেই তাদের অনুসৃত ধর্মে হলো ইন্দ্র-বরুণ-ঊষা–অগ্নি প্রভৃতি দেব-দেবীর সৃষ্টি। বাংলাদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ‘ভেড্ডিড’ বলে চিহ্নিত। তারাও ছিল প্রকৃতি-পূজক। আর্য-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে এ জনপদে আর্য-অনার্য আরাধ্যদের মধ্যেও সংঘটিত হয় এক সংমিশ্রণ-সমন্বয়ের প্রক্রিয়া। এখানে এসব ঘটছে যখন, প্রতীচ্যে তখন এথেনীয় যুগের অবসানে আরম্ভ হয়েছে হেলেনীয় যুগ। উদ্ভবকালের বিচারে হেলেনীয় সভ্যতা নবীনতর হলেও প্রথমে গ্রীক ও পরে রোমানদের অবদানে সমুজ্জ্বল। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস আয়োনীয় যুগ, এথেনীয় যুগ ও হেলেনীয় যুগ, এই তিনটি স্তরে বিভক্ত। আয়োনীয় যুগে মাইলেটাস ছিল গ্রীক রাজ্যে বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ও সমৃদ্ধতম অঞ্চল এবং গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। গ্রীক মনীষার অপূর্ব বিকাশ ঘটে এই আয়োনীয় যুগেই। প্রাচ্যের সকল সভ্যতার ক্রম-সঞ্চিত অবদান নিয়েই গড়ে ওঠে গ্রীক সভ্যতা। এথেনীয় যুগে গ্রীক জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় এথেন্সে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার স্থলে এ যুগে দেখা দেয় ভাববাদী প্রতিক্রিয়া। সক্রেটিস-প্লেটো-এরিস্টটলের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল এই যুগ।

অতঃপর হেলেনীয় যুগে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যাংশ নিয়ে একের পর এক গড়ে ওঠে বিশালকায় গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য। জ্ঞানে-বৈভবে-গরিমায় উন্নতশির এ দু’টি সাম্রাজ্যে বিস্তৃতির বিবরণ আগেই দেয়া হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব প্রাচ্যে-প্রতীচ্যের পটভূমিতে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন, তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও প্রাধান্য বিস্তারে সকল প্রয়াসের মধ্যে যে অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান ছিল, তা হলো প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অর্থাৎ এশিয়া-ইউরোপের মনোবৃত্তিতে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা সম্পর্কিত। আলোচ্যকালে পারস্পরিক সংঘাত থেকে দেখা যায় যে, এশিয়া প্রাচীনতম সভ্যতার অধিকারী হয়েও প্রথমে ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তার করতে এগিয়ে যায় নি; বরং সভ্যতায় নবীনতর হয়েও ইউরোপই প্রথম এগিয়ে এসেছে এশিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে। আরবের উপরও রোমানরা তাদের শাসন চাপানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে কোন কোন রাজ্য দখলও করেছিল। খৃস্টপূর্ব ১১৫ অব্দ থেকে ৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে রাজত্ব করছিল হিমইয়ারী রাজবংশ। এ রাজ্যেও হানা দিয়েছিল রোমানগণ। কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তাদের সে প্রচেষ্টা। উত্তর-আরবের নাবাতিয়ান রাজ্যের

রাজধানী পেত্রাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল যে সমৃদ্ধ জনপদ, ১০৫ খৃস্টাব্দে সেখানেও পরিচালিত হয় রোমান অভিযান। পার্থিয়ান ও রোমান সাম্রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত পালমিরা রাজ্যেও অভিযান চালিয়ে রোমানরা তা দখল করে নেয় খৃস্টীয় প্রথম শতকে।

৬১৪ খৃস্টাব্দে পারস্যের নেস্টোপিয়ানরা জেরুজালেম অধিকার করে খৃস্টানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নষ্ট করে ও খৃস্টের মর্যাদাবোধক নানা দ্রব্য নিয়ে চলে যায় তাদের রাজধানী সেতিফনে। নেস্টোরিয়ানরাও ছিল খৃস্টান। তবে গ্রীক চার্চের ঘোষিত বিধান মতে ধর্মবিরোধী বলে প্রচলিত খৃস্টধর্ম থেকে তারা ছিল বহিষ্কৃত। শুধু মানবতাবাদী খৃস্টান বলেই নয়, নেস্টোরিয়ানদের মুখের ভাষাও গ্রীক ছিল না। তদুপরি, খৃস্টান হলেও তারা ছিল প্রাচ্যবাসী। প্রতীচ্যের বিবেচনায় তাই তারা ছিল অনভিজাত।

প্রতীচ্য চার্চের প্রাচ্যবাসীদের গীর্জা এবং জেকোবাইটরাও নেস্টোরিয়ানদের মতই খৃস্টান হিসাবে ছিল অপাংক্তেতেয়! পারস্যের নেস্টোরিয়ানরা তাই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। প্রতীচ্য ধারণার অধিকারী খৃস্টানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে জেরুজালেম দখল করে গীর্জার অপমান করা ছিল সেই প্রতিশোধপরায়ণতার প্রকাশ। অবিশ্য কিছুকাল পর সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কিন্তু পারস্য শক্তিকে বিপর্যস্ত করতে হেরাক্লিয়াসকে একাধিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। দু' বছরেরও বেশি সময় ধরে এসব যুদ্ধের ফলে উভয় শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

এদিকে ভারতবর্ষে আর্যরা তাদের প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যে ধর্মভিত্তিক মতবাদের হানাহানিতে লিপ্ত। সেই হানাহানি ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধবাদের মধ্যে। তারপর খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলে এই হানাহানিতে যুক্ত হলো নতুন মাত্রা। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রীক শাসন। এই অঞ্চলটা এর আগেও কিছুকালের জন্য পারস্যের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বিদেশাগত হুনগন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে পাঞ্জাব-রাজপুতনা-মালব এলাকায় রাজ্য স্থাপন করে। এই দুর্ধর্ষ বিদেশাগতরা ছিল আর্যদেরই মত মধ্যএশিয়ার এক যাযাবর জনগোষ্ঠী। এদের রাজত্বের অবসান হয় আনুমানিক ৫৩২ খৃস্টাব্দের দিকে।

হূনশক্তির অবসানে ভারতবর্ষে চারটি শক্তির উদ্ভব ঘটেঃ এক, গৌড় রাজ্যে রাজা শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি, দুই, থানেশ্বরে বর্ধন বংশীয় বৌদ্ধশক্তি; তিন, কনৌজে মৌখরী বংশীয় বৌদ্ধ শক্তি; এবং চার, মালবে কনিষ্ঠ গুপ্তবংশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ কাটে গৌড়-রাজ শশাঙ্ক আর থানেশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে। অতঃপর এই পূর্বাঞ্চলে আরম্ভ হয় শতবর্ষের জন্য এক অরাজক অবস্থা। এই অরাজক অবস্থার অবসান ঘটে ৫৭০ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধ বংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সমগ্র ভারতবর্ষেই তখন আর কোন একক প্রবল রাজশক্তির অস্তিত্ব ছিল না। ছিল বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন রাজ্য।

ধর্মীয় ও সামাজিকভাবেও এই উপমহাদেশের অবস্থা তখন মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধবাদের হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল বৌদ্ধ শক্তি এবং বেশ কিছু সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত যে 'হিন্দু ধর্ম' তা-ও নেমে গেল আচার-সর্বস্ব সাধারণ স্তরে। সাধারণ মানুষের জন্য হিন্দু বা বিপর্যস্ত বৌদ্ধধর্ম কোনটাই তখন আর মুক্তি-দিশারী হয়ে রইল না। ভারতবর্ষের এই যুগ তখন মানবতার চরম লাঞ্ছনার যুগ। গৌরবোজ্জল বৈদিক যুগের কথা ভুলেই গেল ওই যুগের মানুষ।

ইসলাম-পূর্ব সময়টায় বিদ্যামান তখন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দু'টিমাত্র প্রবল শক্তি, পারস্য শক্তি ও বাইজানটাইন শক্তি। ইরাক থেকে ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্য, আর এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকার অংশবিশেষে বিস্তৃত বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। আর ষষ্ঠ শতকের দিকে পারস্যের শাসনীয় শান-শওকত ও কায়ানী জৌলুস প্রতাপ তার প্রাণশক্তি হারিয়েছে। রাজপুরুষের অত্যাচার-অবিচার-অকর্মণ্যতা ও ভোগ-বিলাসের প্রাধান্য সেখানে। ততদিনে খৃস্টধর্মেও এসে গেছে মহাভ্রান্তি। পল নামক এক ইহুদী খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। বিন্যস্ত করেছে খৃস্টান ধর্মগ্রন্থ, এবং ত্রিত্ববাদের জন্ম দিয়ে খৃস্টীয় একত্ববাদকে করেছে সমাহিত।

হযরত মূসা (আঃ) পরিচালিত একত্ববাদীরাও ততদিনে পুরাপুরি পথভ্রান্ত। দুনিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে ধন-দৌলতকে বানিয়েছে তারা একমাত্র উপাস্য ও কাম্য। ইসলাম-পূর্ব প্রাচ্য-প্রতীচ্যের তখন এই-ই ছিল সাধারন অবস্থা। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ঘোরতর শত্রু, এক জাতির অন্য

জাতির চরম বৈরী, এক গোত্র অন্য গোত্রের রক্তপিপাসু। লোভ-লালসা-জিঘাংসা-হত্যা-লুণ্ঠনের তখন অবাধ রাজত্ব।

এতদিনকার চলমান মানব-সভ্যতা যেন স্তব্ধবাক। ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যাক্কেবের মতে, মানুষের জ্ঞান-চর্চার যে ক্রমসঞ্চিত অবদান পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত গ্রেকো-রোমান নগরীগুলোর লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল লক্ষ লক্ষ গ্রন্থরাজিতে, তা ধ্বংস করে দিয়েছিল খৃস্টান ধর্মান্ধরা। পুড়িয়ে দিয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগার। আরব দেশে চলছে তখন 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা 'অন্ধকার যুগ'।

বিশ্বনবীর (সাঃ) আগমন

এমনি এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবেই জন্ম নিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য সত্যপথ-প্রদর্শক, সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তির দিশারী রহমাতুললিল আলামীন, ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ের অবসানে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রারম্ভকাল। এই প্রারম্ভকাল সারা বিশ্বের মানুষের সামনে প্রথম এক আদর্শ কল্যাণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গৌরবে সমুজ্জ্বল। সেই আদর্শ কল্যাণ-রাষ্ট্রের মহান রূপকার ছিলেন ইসলামের মহানবী (সাঃ)। মদীনার সকল ধর্মমতাদর্শীদের পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রণীত 'মদীনা সনদ' এর নীতিমালার উপর স্থাপিত হয়েছিল যে ক্ষুদ্র কল্যাণ রাষ্ট্রটির ভিত্তি, তার লক্ষ্য ছিলঃ এক. বহুধাবিভক্ত মদীনাবাসীদের গৃহযুদ্ধ, গোত্রযুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, দুই. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করা; তিন. মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মৈত্রী, সদ্ভাব ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা; এবং চার. মদীনায় ইসলাম-ভিত্তিক মানবকল্যাণধর্মী এক সার্বজনীন প্রজাতন্ত্রের মূল প্রতিষ্ঠিত করা।

মোটামুটিভাবে মদীনা-সনদের সারমর্ম ছিল ঃ "মদীনার ইহুদী নাসারা পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলেই এই দেশবাসী। সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান। ইহুদী নাসারা পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ ধর্ম

পালন করবে। কেউই কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেউ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিনানুমতিতে কারো সহিত যুদ্ধ করবে না। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে আল্লাহ ও রাসূলের মীমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করতে হবে। বাহিরের কোন শত্রুর সহিত কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। মদীনা নগরীকে পবিত্র মনে করবে এবং যাতে ইহা কোনরূপ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখবে। যদি কোন শত্রু কখনও মদীনা আক্রমণ করে তবে তিন সম্প্রদ্রায় সমবেতভাবে তার প্রতিরোধ করবে। যুদ্ধকালে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করবে। নিজেদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হলে অথবা শত্রুর সহিত কোন রূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তার সমুচিত শাস্তি বিধান করা হবে- সে যদি আপন পুত্রও হয়, তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে না। এই সনদ যে বা যারা ভঙ্গ করবে, তার বা তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত"। (বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা, চতুর্দশ সংস্করণ ১৯৭৬, পৃঃ ১৭৮)। সপ্তম শতকের প্রথম পাদে রচিত এই সনদ নিঃসন্দেহে অভাবিতপূর্ব। ঐতিহাসিক ম্যুরের মতে, এই মদীনা সনদ মুহাম্মদ (সাঃ) এর অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগেই নয় বরং সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানবদের কাছেই তা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। তারপরই ইসলামের সর্বব্যাপী উত্থান ও মানব মুক্তির প্রত্যাশা।

অতঃপর প্রত্যাশার চড়াই-উৎরাই'র মধ্য দিয়ে এই কল্যাণ রাষ্ট্রটির দ্রুত বিস্তৃতি এবং নবীজি (সাঃ)-এর রেসালতকালে ও পরে খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকালের অবদান নিয়ে ইতিহাস চিরমুখর। ইতোমধ্যেই পারস্য, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সিরিয়া-জর্ডান-প্যালেষ্টাইন ও মিসরের বিশাল ভূখণ্ড, ত্রিপলি এবং সাইপ্রাস ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত। বলা যায়, গ্রেকারোমানদের অধিকৃত অনেক রাজ্যের পুনরুদ্ধার।

তারপর? খোলাফায়ে রাশেদা যুগের অবসানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো বংশানুক্রমিক মুসলিম রাজতন্ত্র। ৬৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া বংশীয় শাসনকাল। বিলুপ্ত হলো রাষ্ট্র পরিচালনায় খলীফাকে পরামর্শ দানকারী মজলিস। খলীফাই হলেন রাষ্ট্রের সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। পঞ্চম উমাইয়া খলীফা দ্বিতীয় উমর ইবনে আবদুল আজিজের প্রায় তিন বছরের শাসনামলে, স্বল্পকালের জন্য ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল ইসলামী খেলাফতের দ্যুতি।

এরপর বহুদিন ধরে অমিতবিক্রম মুসলিম শাসনের শান ও শওকতময় অগ্রাভিযান, তার গৌরব সূর্যের মধ্য গগণে অবস্থান এবং এক সময়ে অপরাহ্নের অপরিহার্যতায় আত্মসমর্পণ। তাই তো স্বাভাবিক। খলীফা হযরত মুয়াবিয়া ছিলেন সুদক্ষ এক সমরনেতা, সুযোগ্য এক শাসক এবং গযনী-কাবুল-উত্তর আফ্রিকা বিজয়ী অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক আরব নৃপতি। উমাইয়া বংশের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য খলীফা ছিলেন আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খৃঃ) ও প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খৃঃ)। খলীফা প্রথম ওয়ালিদের সময় বিজিত হয় মধ্য-এশিয়ার বলখ্-ফরগনা-তুখারিস্তান, ভারতের সিন্ধু ও মুলতান রাজ্য, সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা এবং ইউরোপের স্পেন। তারপর খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে অবসান হয় উমাইয়া শাসন।

খলীফা আবুল আব্বাসের মসনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে আরম্ভ হয় ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫০৮ বছরের আব্বাসীয় শাসনামল। এই আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেশক থেকে স্থানান্তরিত হয় বাগদাদে। আব্বাসীয় শাসনের কাল ছিল প্রধানত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের কাল। কিন্তু এ কালের দ্বিতীয় খলীফা আল-মনসুর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণেও মনোযোগী হন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে এই সম্প্রসারণের প্রয়োজনও ছিল। বিভিন্ন বিদ্রোহী ও আক্রমণকারীকে পরাস্ত করে আল-মনসুর তাবারিস্তান, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান ও উত্তর আফ্রিকায় আব্বাসীয় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। তিনি বাইজানটাইন সম্রাটের আক্রমণ প্রতিহত করে তাকে কর দানে বাধ্য করেন। পরবর্তীতে খলীফা হারুনুর রশীদের সময়ে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। তার আমলেই প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে বাগদাদ নগরী পরিণত হয় দুনিয়ার এক রূপকথার নগরীতে। অতঃপর তদীয় পুত্র খলীফা আল-মামুনের ২০ বছরের শাসনকাল আব্বাসীয় খেলাফতের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত হয়। রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়ে খলীফা আল-মামুন সিসিলি ও ক্রীট দ্বীপ দখল করে নেন। তার আমলেই চাপাপড়া গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যকে আত্মস্থ্ করে এবং তাতে নিজেদের প্রতিভার অবদান মিশিয়ে মুসলিম মনীষীরা বিস্তৃত করতে থাকেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণ দিগন্তকে। "বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন ইসলামের উত্থান ও ব্যাপ্তিকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে যেসব বিপ্লব একটা নতুন ও চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ও

স্মরণীয় বলে বর্ণনা করে গেছেন। নতুন বিশ্বাসে ঐকান্তিক আগ্রহ সমন্বিত আরব মরুভূমির অপেক্ষাকৃত ছোট একটা বেদুইন দলের নিকট প্রাচীনকালের দু'দুটো বৃহৎ সাম্রাজ্য অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কিভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ ও পরাজয় বরণ করলো, তা ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সশস্ত্র অভিযানের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের (সাঃ) শান্তিবাণী প্রচারের অতুলনীয় ধর্মদিকারী ভূমিকা অবলম্বনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাঁর অনুসারীরা একদিকে ভারতের প্রান্ত সীমানা থেকে অন্যদিকে অটলান্তিক সাগর তীর পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে জয়যুক্ত করে তুলেছিলেন। ইসলাম অনুসারীদের এ বিজয় অভিযান সম্পর্কে শ্রী রায় আরও বলেন, "এ যেন এক ভীষণ ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড। কিভাবে এতবড় আজগুবি ব্যাপার সম্ভব হলো, এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা আজও হতভম্ব হয়ে যান। আজকের জগতের সত্যিকার শিক্ষিত লোকেরা 'ইসলামের উত্থান শান্ত ও সঞ্চিষ্ণু লোকদের উপর গোড়ামির জয়' এই ঘৃণ্য অভিমত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ইসলামের এই বিজয় অভিযানের কারণ ছিলো এক অননুভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সুরের মধ্যে লূকিয়ে; গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন, এমন কি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় ঘুণ ধরে যাওয়ায়, বিপুল জনসাধারণ যে চরমতম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হলো, তা থেকে বাঁচিয়ে ইসলাম এক আলোঝলমল দেশের নির্দেশ তাদের দিতে পেরেছিলো বলেই তার এই অসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিল"। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত। আর শান্তি দাতাও তিনি। তাই ইসলামী অনুসাশন মেনেই মানবতা বেশি শান্তি পায়। এযুগে সে বিয়ষটিই ফুটে উঠেছিল।

কিন্তু তারপরেই আরম্ভ হয় আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার যুগ। এর মধ্যে সেলজুক বংশের উত্থান (১০৫৫-১১৯৪ খৃঃ) বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। ততদিনে বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীয় খেলাফত যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্বলতা থেকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে চলে সেলজুকেরা। খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে সুলতান হিসাবে সেলজুকরা প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসকই হয়ে দাঁড়ায়। গযনীর সুলতান মাহমুদ সেলজুকদের এক বিখ্যাত সুলতান। তাঁর মৃত্যুর পর গযনীর ক্ষমতায় আসে তুর্কি গোত্রীয় সেলজুকগণ। তুগ্রীল বেগের আমলে সেলজুকগণ এশিয়ায় একটি পরাক্রান্ত জাতিতে পরিনত হয়। তিনি আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের হৃত

গৌরব পুনরুদ্ধারই করেন নি শুধু, বাইজানটাইনদের বাকি রাজ্যাংশও দখল করে নেন। তুগ্রীলের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আল্প্ আরসালান (১০৬৩-৭২খৃঃ) এবং তাঁর পুত্র মালিক শাহ্ (১০৭২-৯১ খৃঃ) বীরত্বের সঙ্গে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে বিপদমুক্ত রাখেন। মালিক শাহ্র শাসনামলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে কাশ্মীর থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং উত্তরে জর্জিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ওদিকে ফাতেমীয় বংশের উদ্যোগে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয় এক শক্তিশালী শিয়া খেলাফত। তার স্থায়ীকাল ৯০৯ থেকে ১১৭১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। মিসর ছিল আব্বাসীয় খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ্ আল-মাহদী ৯০৯ খৃস্টাব্দে বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শিয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফাতেমীয় বংশের চতুর্থ খলীফা আল-মুইজ মিসরে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। ৯৫৫ খৃস্টাব্দে তিনি দখল করে নেন মরক্কো। আল-মুইজের পুত্র আল- আজিজ মসনদে আরোহণ করেন ৯৭৫ খৃস্টাব্দে। তাঁর রাজত্বকালেই ফাতেমীয় প্রতিপত্তি ও গৌরব চরম শিখরে উন্নীত হয়। রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয় আটলান্টিক মহাসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত। পরাক্রমশালী খলীফা আল-আজিজ হয়ে ওঠেন বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত এবং স্পেনের উমাইয়া খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের উপরোউক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা যে, ক্রুসেড-পূর্বকালে মুসলিম প্রাচ্যে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হলেও তার আঞ্চলিক শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তখনও অস্তিত্ববান। ভৌগোলিকভাবে ইউরোপ বা প্রতীচ্য তখন মুসলিম শক্তিসমূহ দ্বারা প্রায় তিন দিক থেকেই পরিবেষ্টিত হয়ে এসেছে। ইউরোপীয় দেশ স্পেনে প্রতির্ষ্ঠিত রয়েছে উমাইয়া খেলাফত, ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত এবং উত্তর আফ্রিকা জুড়ে আব্বাসীয় খেলাফত, আর মিসরে ফাতেমীয় খেলাফত। অন্যদিকে খৃস্টান প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যাংশে বিভিন্ন রাজ্য-শক্তি সামন্ততন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ এবং বাইজানটাইন শক্তি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। মুসলিম প্রাচ্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সংস্কৃতি-সামাজিকতায় অনেক অগ্রসর ও আলোকপ্রাপ্ত; ধর্মীয় দিক থেকে প্রায় কলহমুক্ত। কিন্তু খৃস্টান প্রতীচ্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শুধুমাত্র অনগ্রসরই নয়, রীতিমত অন্ধকারাচ্ছন্ন; সাংস্কৃতিক-সামাজিকভাবে ও ধর্মীয় দিক থেকে বিধ্বস্ত এবং কলহযুক্ত। সামন্ত প্রথার আবর্তে পতিত কলুষিত সমাজ-

ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীদের পুত্রগণ দ্বন্দ্ব-কলহে সর্বদা নিয়োজিত এবং এমনি পরিস্থিতিতে প্রতীচ্যে একক প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যাজকতন্ত্রের শীর্ষে অধিষ্ঠিত রোমের মহামান্য পোপ।

এমনি প্রেক্ষাপটে এবার আমাদের আলোচনা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্য সমাচার সম্পর্কে।

সেকালের বাণিজ্য সমাচার

জীবনের তাগিদেই মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। যদিও পৃথিবীর কোন শক্তি কখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা করেছিল তার ইতিবৃত্তের সন্ধান না করেও বলা যায়, সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই মানুষ নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন করেছিল। আর তার মাধ্যমে মানুষ যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে খুঁজে পেলো প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ লাভের চাবিকাঠি, তখনই আরম্ভ হলো একের উপর অন্যের প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা। জাতিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুধু আজকের নয়, বরাবরেই অমোঘ এক সত্য। এই প্রয়াসের পথে সংঘর্ষ বেধেছে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বিভিন্ন জাতি এবং উত্থান-পতনের পথ ধরে রচনা করেছে ইতিহাস। এই প্রয়াসে সাফল্য লাভ করেই এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। কালে কালে সে প্রাধান্যের হয়েছে হাতবদল্। প্রাচীন যুগে ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক বাণিজ্যে ঈজিয়ানদের প্রাধান্য কালের অবসানে দেখা দেয় ফিনিসিয়ানদের প্রাধান্য কাল, তারপর গ্রীকদের এবং তারও পরে রোমানদের প্রাধান্য। রোমানদের পর প্রাধান্য পেলো বাইজানটাইনীয়রা এবং তার পরেই আরব-পারসিক মুসলিমরা।

ভূমধ্যসাগরের অন্যতম দ্বীপের নাম ক্রীট। ক্রীট দ্বীপে প্রাচীন সভ্যতার যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার অস্তিতকাল প্রায় হাজার পাঁচ বছর আগের বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ঈজিয়ান সভ্যতা। ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল ঈজিয়ানদের জীবিকার প্রধান উপায়।

ঈজিয়ানদের পরে ফিনিসিয়ানদের হাতে চলে আসে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের প্রাধান্য। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে অর্থাৎ, প্রাচ্যে ছিল ফিনিসিয়ানদের বাসস্থান অর্থাৎ, এশিয়ার সেই অংশে যাকে বলা হত

লেভান্ট বা আধুনিক রাজ্য সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি। ফিনিসিয়ানদের বাসভূমির উত্তরে এশিয়া মাইনর, যার আধুনিক নাম তুরস্ক। এখানেও প্রায় একই সময়ে যে সভ্য জাতির বাস ছিল, তাদের নাম হিটাইট। তারাও ছিল বাণিজ্যপটু এক জাতি। ফিনিসিয়ানদের বাণিজ্যবৃত্তির কাহিনী জগদ্বিখ্যাত।

"ফিনিসিয়ানরা ভূমধ্যসাগরে মাছ ধরত আর তা ফেরি করতে আসত ব্যাবিলন পর্যন্ত। এরা নানা দেশের অনেক রকম জিনিসপত্র এনে গ্রীসে, ইটালিতে, মিসরে, এশিয়া মাইনরে, প্যালেষ্টাইনে, এসাইরিয়ায় ও ব্যাবিলনে বিক্রি করত। সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, কাঠ, মাছ, নানা প্রকার শস্য ও সবজি, পোড়ামাটির বাসন ও মূর্তি, এমন কি বাঁদর, ময়ুর প্রভৃতি সংগ্রহ করেও ব্যবসা করত। তারা নীলনদ থেকে লোহিত সাগরে আসবার জন্য একটা চলনসই রকমের খাল তৈরী করে নিয়েছিল। আর ওই খাল বেয়েই গ্রীসের, রোমের ও হিন্দুস্থানের বাণিজ্য জাহাজ বা বড় নৌকা, যাই বলি না কেন যাতায়াত করত"। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা- যা সাধারণত মেসোপোটেমীয় সভ্যতা নামে পরিচিত, তার অগ্রগতির মূলে কার্যকর ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি। হাম্মুরাবির আইনে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যে নির্দেশ ছিল তাতে বণিকদের অসাধুতার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। এই আইনে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা ও লোভের জন্য সাবধান করে দেয়া হয়।

ফিনিসিয়ানদের পর বাণিজ্যে প্রাধান্য আসে প্রথমে গ্রীক ও পরে রোমানদের হাতে। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মিসরে আলেকজান্দ্রিয়া নামে যে বন্দর-নগরী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার সঙ্গে জলপথে ভারতবর্ষের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, ইতিহাসে তা বিধৃত আছে। ভারতবর্ষের বণিকদলের যাতায়াত ছিল আলেকজান্দ্রিয়া ও পালমিরা প্রভৃতি বন্দরে। আবার গ্রীস-রোমের জাহাজ আসত গুজরাটের ব্রোচ বন্দরে। ব্রোচ থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত ছিল বাণিজ্যের রাজপথ। উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের গুপ্ত রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী, মূল রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে বা আধুনিক পাটনায়।

প্রাচ্যের অন্যতম সম্পদ-সমৃদ্ধ বিশাল জনপদ ভারতবর্ষ অতীতে প্রতীচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থোপার্জন করত, সে সম্পর্কে খৃস্টীয় প্রথম শতকে ইটালিয়ান ঐতিহাসিক প্লিনির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "In no year does India drain our Europe off less than fifty five millions of 'sesterces giving back her own wares in exchange,

which are sold at once hundred times their primal cost" কোন বছরই ভারতবর্ষ আমাদের ইউরোপ থেকে কমের মধ্যে হলেও পঞ্চাশ মিলিয়ন 'সেসটারসেস' তার নিজ পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বের করে নিয়ে যায়, যা সেসবের মূল খরচের শতগুণ বেশি দামে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়"।

"কোন পুরাকালে ভারতবর্ষ এইরূপ শিল্পদ্রব্য বিনিময়ে বিবিধ দূরদেশ হতে অর্থলাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, ইতিহাসে তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন প্রাচ্যের তুলনায় অধিকাংশ প্রতীচ্য জনপদ নিরক্ষর জাতির আবাসভূমি বলেই পরিচিত ছিল"। ভারতবর্ষে তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল। এ সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমানা পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্ত থেকে রোমান রাজ্য ছয়-সাত'শ মাইলের বেশি ছিল না। গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে রোমান রাজাদের সৌহার্দেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, গুপ্ত রাজন্যবর্গ ছিলেন ভারতবর্ষে অভিযানে এসেছে মধ্যএশিয়ার আর্য গোষ্ঠীভুক্ত শুঙ্গ-গ্রীক-শক-হুন-কৃষাণেরা। কাজেই গুপ্তদের সঙ্গে গ্রীক-রোমানদের সম্পর্ক থাকার ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

রোমান প্রাধ্যান্যে প্রতীচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এক বিপজ্জনক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। সেখানে ঘটে গেছে তখন গথ-হুন-ভ্যাণ্ডাল-মোঙ্গলদের আক্রমণ। বিধ্বস্ত হয়ে গেছে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অনেক অবদান। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী রাস্তাঘাট হয়ে পড়েছে যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনি দূর্গম। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠেছে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্যিক সংযোগ। রোমান সাম্রাজ্যেরই পূর্বাংশে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। কনস্টান্টিনোপল তখন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং বাণিজ্যকেন্দ্র। ভূমধ্যসাগর-কেন্দ্রিক বাণিজ্যে তখন বাইজানটাইনীয়দের প্রাধান্য। এই প্রাধান্যকালের বিস্তৃতি খৃস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত, যা ছিল মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়।

পশ্চিম ইউরোপে চলছে তখন নতুন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিন্যাস। রোমান শক্তির পতনে জনসাধারণের মাঝে এসেছে এক বিরাট শূণ্যতা। রোমান রাজশক্তি আর নেই, রোমান প্রভাবিত ধর্মীয় ধারণাও বিলুপ্তপ্রায়। প্রায় সংস্কৃতিবিহীন সামন্ততন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তার পাশাপাশি খৃস্টীয় যাজকতন্ত্রও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পশ্চিমে ইউরোপকে

ঘিরে ধরেছে এক গাঢ় অন্ধকার। যাজকরাও সামন্ত হওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল। অর্থনৈতিকভাবে অ-খৃস্টান ও খৃস্টানদের সামন্ততন্ত্র এবং ধর্মীয়ভাবে খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র মিলে এক নৈরাজ্যজনক অবস্থা। পুরাপুরি কৃষিভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক পরিস্থিতি। প্রচলিত মুদ্রার প্রচণ্ড অভাবের জন্য রাজ্যে রাজ্যে চালু হয়ে গেছে বার্টার সিস্টেম, স্থানীয়ভাবে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের আদান-প্রদান।

মুসলিমদের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য

সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত মধ্যযুগের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে ভূমধ্যসাগর-কেন্দ্রিক বাণিজ্য প্রাধান্য এসে গেল মুসলিমদের হাতে। এই সময়ের মধ্যে প্রতীচ্য প্রায় তিন দিক থেকেই মুসলিম নিয়ন্ত্রিত এলাকা দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে গেছে। মুসলিমদের এমনি এলাকা নিয়ন্ত্রণের প্রভাব অনুভূত হলো শুধুমাত্র নব বিজিত জনপদসমূহেই নয়, তার প্রভাব অনুভূত হলো পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জনপদেও এবং তা অনুভূত হলো যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনে, তেমনিভাবে অর্থনৈতিক জীবনেও, তারই সুবাদে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপ তথা মুসলিমদের এই যে বিপর্যয়, তার কারণঃ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্যের জন্য যে তিনটি প্রধান পথ ছিল তার সব ক'টিই চলে গিয়েছিল মুসলিম শক্তির নিয়ন্ত্রণে।

প্রধান প্রধান পথে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের পণ্যদ্রব্য নিয়ে তাদের জাহাজগুলো সুরাট ও কালিকট বন্দর থেকে পাড়ি জমাত পারস্য উপসাগরের তীরস্থ বসরা বন্দরে। সেখানে মালামাল উঠত উটের পিঠে। কাসপিয়ান সাগরের কোলে আর্মেনিয়া ও শহর তাবরিজ, কৃষ্ণ সাগরের তীরে ট্রাবজন, সিরিয়ায় আলেপ্পো দামেশক প্রভৃতি স্থানে তা বিক্রি হয়ে যা বাঁচত, তা আসত ভূমধ্যসাগরের বন্দরে। সে বন্দর থেকে জাহাজে করে সেই উদ্বৃত্ত মালামাল নিয়ে যেত ইটালির ভেসিন ও জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা-যাদের বলা হত লোম্বার্দ। এই লোম্বার্দরাই সেসব মাল ছড়িয়ে দিত সমগ্র ইউরোপে।

দ্বিতীয় প্রধান পথটি ছিল সুরাট-কালিকট বন্দর থেকে সোজা কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত বিস্তৃত। কৃষ্ণসাগরের অন্য তীরে অবস্থিত এই কনস্টান্টিনোপল বন্দরটি ছিল ইউরোপের প্রধান বন্দর। কৃষ্ণসাগরের অন্য

তীর থেকেই আরম্ভ হয়েছে এশিয়া ভূখণ্ড। ইউরোপের নানা স্থান থেকে বণিকেরা এসে মালামাল কিনত মুসলিম বণিকদের কাছ থেকে।

তৃতীয় প্রধান পথে মিসরের মুসলিম বণিকেরা ভারতবর্ষের মালামাল নিয়ে উপস্থিত হত এডেন বন্দরে। তারপর লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে হাজির হত সুয়েজে। সেখান থেকে উটের পিঠে মাল বোঝাই করে চলে যেত কায়রো, কায়রো থেকে নৌ পথে আলেকজান্দ্রিয়া। সেখানে ভিড় করত এসে ইউরোপের বণিকেরা। এখান থেকে মুসলিম বণিকদের মাল কিনে নিয়ে তারা দেশে ফিরত।

এর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রাচ্যের মালামালের একচেটিয়া ব্যবসায়ী তখন আরব পারসিক তথা মুসলিম বণিকেরা। প্রতীচ্যের বণিকেরা প্রাচ্যে থেকে আনীত মালামালের অংশ অনেক চড়া দামে কিনে নিয়ে তা ফেরি করে বেড়াত ইউরোপের আনাচে-কানাচে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবসা করে ফিরত প্রধানত মুসলিম বণিকেরা। অর্থাৎ, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে এই যে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য, তার মুনাফার সিংহভাগ ভোগ করত মুসলিম বণিকেরাই। ভূমধ্যসাগরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তখন আরবদের। তাদের অনুমতিক্রমেই শুধু অন্যান্য দেশ ও জাতির বাণিজ্য পোত সেখানে ভিড়তে পারত।

একদিকে সমরকন্দ থেকে ভারতবর্ষের লাহোর, অন্যদিকে আটলান্টিক হয়ে স্পেন বিশাল এ সাম্রাজ্যের অধিকারী মুসলিম শক্তির সামনে উম্মুক্ত তখন বাণিজ্যভিত্তিক অতুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডার। এমনি অবস্থায় প্রাতীচ্যের রাজ্যগুলো যে হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরবে, এ তো স্বাভাবিক। তবুও কথা থেকে যায়। আরবরা তো বরাবরই বণিকের জাতি। সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত। একাধিপত্য না থাকলেও সেই প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্যে আরবরা বরাবরই শামিল ছিল। খৃস্টীয় সপ্তম শতক থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে সেই বাণিজ্যের পূর্ণ আধিপত্য এসে গেল আরব পারসিক তথা মুসলিম বণিকদের হাতে। ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচ্য-প্রতীচ্য বাণিজ্যের আধিপত্য এর বহু আগে থেকেই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর হাতে ছিল। নতুন ব্যবস্থায় আধিপত্যহীন জাতিগুলো ক্ষুব্ধ ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই মুসলিম আধিপত্যকালে প্রতীচ্যের ক্রোধ, বিশেষ করে খৃস্টীয়

যাজকতন্ত্রের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেল। ক্রুসেডের মাধ্যমে সে ক্রোধ যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা ভয়ঙ্কর দানবীয় রূপে। কেন?

প্রাচ্যের বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে জীবন ধারনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এমন সব জিনিস থাকত যা না পেলে ইউরোপীয়দের চলতই না। এসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় ছিল মসলা। ইউরোপের সর্বত্র এই প্রবল মসলাপ্রীতির কারণ ছিল দু'টি। একটি খাদ্য সংরক্ষণ, অন্যটি ভৈষজ্য প্রয়োগ। সেকালে ইউরোপে সর্বসাধারণের প্রধান খাদ্য ছিল গোস্ত। সেখানে শাক-সবজির চাষ, এমনকি আলুর চাষও শুরু হয় অনেক পরে। যেসব ফল একালে ইউরোপে সাধারণভাবেই জন্মে, তারও কোন চিহ্ন তখন ছিল না। এখনকার মত তখন গোস্ত সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ বিশেষ করে শীত ঋতুতে তাজা গোস্তের ছিল অত্যন্ত আয়াসলভ্য। কাজেই গোস্ত সংরক্ষণ ছিল গোস্ত সংগ্রহের মতই অপরিহার্য ব্যাপার। এ কাজ করা হত মসলা দিয়ে। মসলা শুধু গোস্ত সংরক্ষণই করত না, বাসি গোস্তের দুর্গন্ধ দূর করে তাকে খাদ্যোপযোগী করেও তুলত। এ কার্যে প্রধান সহায় ছিল গোলমরিচ। তারপর ভেষজের কথা।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি ... (তখন) কোথাও আধুনিক ভেষজের সৃষ্টি হয়নি। ... গাছপালা থেকে তৈরি নানা মুষ্টিযোগ বা টোটকা ওষুধই ছিল রোগে মানুষের ভরসাস্থল। হিন্দুস্থানে তৈরি নানা প্রকার আয়ুর্বেদীয় ভেষজের সুনাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে পারশ্য ও আরবের দৌত্যে। তাছাড়া ইউরোপের নানা জাতের নাবিকের বিভিন্ন মসলা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেও"। এসব মসলার মধ্যে ছিল গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, আদা, দারুচিনি, জায়ফল, জয়ত্রী, তেতুল ইত্যাদি। মসলা ছাড়াও তখনকার ইউরোপীয়দের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল চন্দন কাঠ, ভাঙ ও আফিস। ভাঙ ও আফিস এর ভৈষজ্য শক্তি অসাধারণ। এসব মসলার বেশিরভাগই চালান যেত দ্বিতীয় প্রধান পথটি দিয়ে কনস্টান্টিনোপলের দিকে; সেখান থেকে ভেনিসে। দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূল ও লঙ্কাদ্বীপ (সিংহল বা আধুনিক শ্রীলঙ্কা) ছিল যথাক্রমে গোলমরিচ ও দারুচিনির প্রাপ্তিস্থান। দূর প্রাচ্যের সুমাত্রা দ্বীপও ছিল গোলমরিচের জন্য বিখ্যাত। তদুপরি, বিখ্যাত ছিল মালাক্কা দ্বীপের লবঙ্গ, এ্যামবমিয়া ও বান্দা দ্বীপের জয়ত্রী ও জায়ফল। আরব পারসিক বণিকেরা দূর প্রাচ্যের এসব মসলা জাহাজে করে উপস্থিত হত এসে মালাবারের

কালিকট বন্দরে। তার সঙ্গে যোগ হত হিন্দুস্থানের মসলাদি, মণিমুক্তা ও অন্যান্য পণ্য।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই বাণিজ্য পথের জংশন ছিল যেন ভারতবর্ষের উপকূলীয় বন্দর গুজরাটের সুরাট ও মালাবারের কালিকট। চীন থেকে আরম্ভ করে দূর প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিংহল ভারতের বাণিজ্য পণ্যবাহী জাহাজগুলো ভিড়ত এসে সুরাট ও কালিকট বন্দরে; সেখান থেকে প্রধান তিনটি বাণিজ্য পথে রওনা করত প্রতীচ্যের দিকে। আরব পারশিক মুসলিম বণিকদের হাতে এসব বাণিজ্যপথের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যখন এসে গেল, তখন স্বাভাবিকভাবেই অসুবিধায় পড়ল প্রতীচ্যের রাজ্যগুলো। সেসব রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তখন হয়ে পড়ল দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের পাইকার জাতীয় ব্যবসায়ী।

এই অর্থনৈতিক বিবেচনার বাইরে খৃস্টান প্রতীচ্যের আরও একটি বিবেচনা এবং আমাদের মতে সেটাই প্রধান বিবেচনা, নিশ্চয়ই ছিল। সেটা হচ্ছে ধর্মীয় বিবেচনা। ধর্মীয় পরিচয়ে ততদিনে আরব-পারসিক বণিকেরা হয়ে গেছে ইসলাম অনুসারী, মুসলমান। একদিকে রাজ্যবিজয়ী, অন্যদিকে বাণিজ্যবিজয়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশে বিষিয়ে উঠল খৃস্টান প্রতীচ্যের মন ও মানস। অথচ অতীতে কি রাজ্যবিজয় বিষয়ে কি বাণিজ্যবিজয় বিষয়ে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির মন ও মানস তো এতটা বিষিয়ে ওঠেনি। এবারই খৃস্টান প্রতীচ্যের কাছে মুসলিম প্রাচ্য হয়ে দাঁড়াল এক বিপজ্জনক জানী দুশমন। এই 'জানী দুশমন' হওয়ার অন্য কারণটা ইসলাম অনুসারী হওয়ার মধ্যেই নিহিত নয় কি? অর্থাৎ, 'ওরা ইসলাম অনুসারী মুসলমান' ওরা রাজ্যবিজয়ী ওরা বানিজ্যবিজয়ী, ওরা ভৌগোলিকভাবে প্রায় তিন দিক থেকে আমাদের অস্তিত্বকে ঘিরে ধরেছে। তাই ওরা আমাদের 'জানী দুশমন'। খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র প্রভাবিত সামন্ততন্ত্রী প্রতীচ্যের মন-মানসের গভীরে এ-ই ছিল সত্যিকার ধারণা। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে মুসলিম প্রাধান্যকে প্রতিরোধ করতে না পেরে নিজেদের অনগ্রসর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন-মানসিকতাকে ও রাষ্ট্রীয় অযোগ্যতাকে ঘৃণা-বিদ্বেষের দানবীয় সব উপাদানে আবৃত করে, জানী দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৈরি হলো প্রতীচ্য। এ কাজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করল খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র, সহযোগীর ভূমিকায় রইলো সামন্ততন্ত্র। দানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হলো অশিক্ষিত দুশ্চরিত্র পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত অকর্মণ্য সামন্ত-সন্তান আর আপামর যুবসমাজকে।

প্রতিশোধ গ্রহণের এই আগত ধ্বংসযজ্ঞে সর্বাগ্রে উপস্থাপিত করা হলো ধর্মকে। আবেগমথিত কণ্ঠে ঘোষিত হলোঃ উদ্ধার কর পবিত্র জেরুজালেম!!

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সেনাপতি আমর ইবনুল আ'স খৃস্টানদের নিয়ন্ত্রণ থেকে উদ্ধার করেছিলেন জেরুজালেমসহ সমগ্র প্যালেস্টাইন। জেরুজালেমের খৃস্টান অধিবাসীদেরই অনুরোধে খলীফা স্বয়ং সেখানে গিয়ে ঘোষণা করলেন মুসলিম অধিকৃত জেরুজালেমে খৃস্টান-ইহুদী-মুসলিম সকলেরই জন্য সমান ধর্মীয় স্বাধীনতা। ইসলামের মহান নবীজি (সাঃ)-এর মিরাজ গমনের স্থান, হযরত দাঊদ (আঃ) এর পুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর স্মৃতিবিজড়িত জেরুজালেম যে সকলের নিকটই সমভাবে পবিত্র।

ঐতিহাসিক জেরুজালেম

হযরত দাঊদ (আঃ) এর পুত্র হযরত সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদ বাইতুল মুকাদ্দাসকে বুকে ধারণকারী জেরুজালেম তথা ফিলিস্তিন ভূমিসহ সমগ্র সিরিয়াই হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত সেই 'পবিত্র ভূমি'। এ ভূভাগটি বণী ইসরাঈলী অনেক অনেক পয়গাম্বরের জন্মস্থান ও সমাধিভূমি। এই 'পবিত্র ভূমি' তাই শান্তিভূমি হওয়াই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে এ 'পবিত্র ভূমি' যুদ্ধবিগ্রহজনিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে বহুবার। বহুবার বিভিন্ন মতবিশ্বাসীদের অস্ত্রচালনার ফলে মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এর মাটি। খৃস্টপূর্ব কালেও, খৃস্টাব্দ চিহ্নিত কালেও। বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর বাবেল-সম্রাট বখতে নসর কতৃক নিয়োজিত জেরুজালেমের শাসনকর্তা তার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে বুখতে নসর বাইতুল মুকাদ্দাসের শহর আক্রমণ করে তা অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়। খৃস্টপূর্ব ১৭০ বছর আগে এন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা-সম্রাট জেরুজালেমের ওপর চড়াও হয়ে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করে, বাকী অনেককেই দাসরূপে সঙ্গে নিয়ে যায়।

আলফ্রেড ডুগান তাঁর রচিত (১৯৬৩) গ্রন্থ 'দি স্টোরি অব দ্য ক্রুসেড্স' এ 'দ্য হোলি প্লেসেস' নামক প্রথম পরিচ্ছেদে এমনি আরও বিপর্যয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। জেরুজালেমে খৃস্টানদের প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয় 'পেন্টিকস্ট' নামক ইহুদী পর্ব পালনের সময়। তখন থেকে জেরুজালেমে খৃস্টানদের বসবাস আরম্ভ হয়। অবিশ্যি সেখানে শত্রুদের অভিযান কালে এসব খৃস্টান বাসিন্দা জেরুজালেম ছেড়ে পালিয়ে যেত মফস্বল অঞ্চলে। এমনি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় ৭১ এবং ১৩৫ খৃস্টাব্দে। ৭১ খৃস্টাব্দে একবার এবং ১৩৫ খৃস্টাব্দে অন্য বার ইহুদীরা তৎকালীন প্রকৃতি পূজক রোমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এবং দু'বারই'তা ব্যর্থতায় পর্য বসিত হয়। ৭১ খৃস্টাব্দে জেরুজালেমের ইহুদী মন্দিরটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয় আর ১৩৫ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ান জেরুজালেমকে ইহুদীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এটাকে রোমান শহরের আদলে পূনর্নির্মিত করেন। রোমানদের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা আরম্ভ হয় সেখানে। তবে খৃস্টানদের গির্জা রোমান সম্রাটের করুণায় টিকে থাকে সেখানে।

অতঃপর আসে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের শাসনকাল। ততদিনে, যীশুখৃস্টের তিরোধানের প্রায় ৩০০ বছর পরে, সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন খৃস্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকার করে নেন। সম্রাট জননী সেন্ট হেলানা কালভারি নামক তথাকথিত 'যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্থানে গমন করেন এবং সেকানকার একটি বিশেষ স্থান খনন করে 'ট্রু ক্রুস' টির সন্ধান লাভ করেন। তারপর সেখানে এক অতি বৃহৎ রোমান প্রাসাদ নির্মাণ করে তিনি সেখানকার সব স্মরণীয় পবিত্র স্থানগুলিকে সেই প্রাসাদ ছাদের অভ্যন্তরস্থ করেন। তাতে করে যিশুখৃস্টের সকল স্মৃতি চিহ্নই সুরক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন বাইজানটিয়াম নগরীতে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করে তার নামকরণ করেন কনস্ট্যান্টিনোপল।

অতঃপর ৪০০ খৃস্টাব্দের দিকে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সমস্যার সমাধান হিসাবে সাম্রাজ্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়— পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য। এড্রিয়াটিক সাগরের পশ্চিমাংশের সকল জনপদ নিয়ে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে রাভেন্না প্রকৃত প্রশাসনিক কেন্দ্র হলেও রাজধানী থেকে যায় রোমে এবং বলকান অঞ্চল ও এশিয়া মাইনরের জনপদসমূহ নিয়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকে

কনস্ট্যান্টিনোপলে। আভিজাত্য ও খৃষ্টানত্বের দিক দিয়ে এই দু'য়ের মধ্যে একটি তারতম্য বোধ বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রোমানীয়রা পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীকগণকে নিজেদের অপেক্ষা কিছুটা নিম্নস্তরের মানুষ বলে মনে করত। তদুপরি, ভাষাগত কৌলিন্যের কথাটাও এমনি মনে করার পেছনে কার্যকর ছিল। দু' সাম্রাজ্যের লোকজনই ততদিনে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ায় উভয়টিতেই গির্জা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্মানিত প্রতিষ্ঠান। পূর্বাঞ্চলীয় গির্জায় প্রার্থনার ভাষা ছিল গ্রীক, আর পশ্চিমাঞ্চলে ল্যাটিন। এদিক থেকে ল্যাটিন ভাষাছিল আভিজাত্যে উচ্চস্থানীয়। পশ্চিমাঞ্চলে রোমের পোপ ছিলেন সে সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ধর্মীয় নেতা। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এমনটি ছিল না। সেখানে ধর্মীয় ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার ছিল সম্রাটের। গ্রীকরা পোপকে সিনিয়ার ধর্মীয় নেতা বলে মান্য করত, কিন্তু তার একার আদেশ নির্দেশই পূর্বাঞ্চলীয়দের কাছে অবশ্য পালনীয় ছিল না। সেখানে অনেকটা 'জুনিয়ার পোপ' জাতীয় ধর্মীয় নেতা ছিলেন জেরুজালেম, এন্টিওক, আলেকজান্দ্রিয়া ও কনস্ট্যান্টিনোপলের গির্জা চতুষ্টয়ের ধর্মীয় প্রধানেরা। যাঁদেরকে নিযুক্ত করতেন সম্রাট। জাতির জন্য কোন বিশেষ আদেশ-নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিলে তার সিদ্ধান্ত নিতেন সকল ধর্মীয় প্রধানদের কাউন্সিল। এবং এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সম্রাট। কাজেই, দু' সাম্রাজ্যের মধ্যে মতভেদ যথেষ্টই ছিল বলতে হবে।

৬১০ খৃস্টাব্দে পারস্যবাসীরা পূর্বাঞ্চলের গ্রীক সাম্রাজ্যে অভিযান চালায়। ৬১৪ খৃস্টাব্দে তারা ইহুদীদের যোগসাজসে অধিকার করে নেয় জেরুজালেম। তখন নিধনযজ্ঞ চালিয়ে অভিযান কারীরা ৬৫ হাজার খৃস্টানকে হত্যা করে, আর দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় ৩৫ হাজারকে। যিশুর স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে যে গির্জা ছিল, তা ভস্মীভূত করে দেয় এবং সেখান থেকে 'ট্রুক্রস' বা 'সেপালকার' টিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্যি, পরবর্তীতে ৬৩০ খৃস্টব্দে সম্রাট হেরাক্লিয়াস পারস্য কর্তৃপক্ষকে পরাস্ত করে যিশুর সেসব স্মৃতি-চিহ্নকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু এই যুদ্ধ চলতে থাকে আরও কিছু সময় ধরে। ফলে উভয় পক্ষই শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে হয়ে পড়ে দুর্বলতর।

এমনি অবস্থায় জেরুজালেমের দৃশ্যপট আবির্ভূত হয় মুসলিম শক্তি। ৬৩৮ খৃস্টাব্দে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে

জেরুজালেম এসে যায় মুসলমানদের অধিকারে। এই অধিকার সুরক্ষিত থাকে একাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত। আর তখনই আরম্ভ হয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

এর ধবতা সমাকার জেরুজালেমে প্রায় ৪৬০ বছরের যে মুসলিম অধিকার, তার সবটুকু সময় কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদা আমলের ইসলামী শাসন ছিল না, তার অধিকাংশ সময়ই ছিল রাজতন্ত্রী মুসলিম শাসন। সেই রাজতন্ত্রী শাসনামলে মুসলিম, গ্রীক ও রোমান শক্তির মধ্যে যে খেলামেলা, তা তো প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি রাজশক্তির মধ্যেকার খেলামেলা। ইতোমধ্যে গথ, হুন, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি 'বর্বর' আক্রমণে পশ্চিমাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বংস্ত হয়েছে, সেখানে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং কালক্রমে সেই সামন্ত ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত হয়েছে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজ্য। আর ক্রমবর্ধমান শক্তির অধিকারী হয়েছে খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র। পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীক সাম্রাজ্যেও রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতন হয়েছে। তেমনি উত্থান-পতনের খেলা জমে উঠেছে মুসলিম সাম্রাজ্যেও।

নড়বড়ে অবস্থায় ইউরোপে (প্রাক্তন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য) সামন্ততন্ত্র তো নতুন বিন্যাসে কতিপয় রাজ্যের জন্ম দিল, কিন্তু সেসব রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারল না। এমনি অবস্থায় সেখানকার একক সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতৃত্ব হিসাবে আবির্ভূত হলেন রোমের পোপ। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, পোপের শুভেচ্ছা ছাড়া ইউরোপের কোন রাজ্যের অধিপতিই জনগণের পুরাপুরি আনুগত্য লাভ করা সম্ভবপর মনে করলেন না। তদুপরি, সমগ্র ইউরোপের কর্তৃত্ব লাভে তো পোপের শুভেচ্ছা প্রধানতম শর্ত হয়ে দাঁড়াল। তাই দেখা যায়, ৮০০ খৃস্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্যে সেখানকার একক সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা রোমের মহামান্য পোপ মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন রাজা শার্লেমেনের মাথায় এবং তাকে রোমানীয়দের সম্রাট বলে ঘোষণা করছেন। নতুন বলে বলীয়ান হয়ে সম্রাট শার্লেমেন সরাসরি বাগদাদস্থ আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করছেন, এবং জেরুজালেমে খৃস্টান তীর্থযাত্রীদের থাকা খাওয়ার সুবিধার জন্য ভবন নির্মাণের অনুমতি নিয়ে। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফার কাছে সম্রাট শার্লেমেন্টের এমনি মর্যাদা দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ও লোকজন।

দশম শতকে পূর্বাঞ্চলীয়রা শক্তিতে আবার প্রবল হয়ে উঠল। সিলিসিয়া তারা কেড়ে নিল পশ্চিমাঞ্চলীয়দের হাত থেকে এবং ৯৬৯ খৃস্টাব্দে দখল করে নিল এন্টিওক। ওদিকে ততদিনে আবার অযোগ্যতার অভিশাপ নেমে এসেছে আব্বাসীয় খেলাফতের ওপর। বাগদাদের খলীফারা অযোগ্য, দুর্বল তাই তারা উজির আমীরদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ফলে, মুসলিম জাহানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত- একটি মিসরে ফাতেমীয় খেলাফত, অন্যটি স্পেনে উমাইয়া খেলাফত। বাগদাদভিত্তিক আব্বাসীয় খেলাফতের শক্তি মিনার কোনরকমে দাড়িয়ে আছে মাত্র। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত হিসাবে আবির্ভূত মিসরের ফাতেমীয় খেলাফত ও তার দুই খলীফা আল-মুইজ (৯৫২-৯৭৫খৃঃ) এবং আল-আমীয়ের (৯৭৫-৯৯৬ খৃঃ) মৃত্যুর পর অযোগ্যতার অতলে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করল। পরবর্তী খলীফা আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খৃঃ) ছিলেন প্রায় উম্মাদ এক ব্যক্তি। অল্প বয়স্ক এই প্রায় উম্মাদ খলীফাটির 'কৃতিত্বের' মধ্যে ছিল দিনে দরবার না বসিয়ে রাতে দরবার বসানো, দিনে রাজধানীর দোকানপাট বন্ধ রেখে রাতে খোলা রাখার নির্দেশদান, জেরুজালেমের 'হোলি সেপালকারসহ কতিপয় গির্জার ধ্বংস সাধন ইত্যাদি। তদুপরি এই খলীফাটি ইসমাঈলী ধর্মতত্ত্বের সূত্র ধরে নিজেকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করে বসেন। তার পরেই তিনি নিহত হন। এরপর ফাতেমীয় বংশের আর মাথা উঁচু করে দাড়াবার সুযোগ বা সামর্থ্য কোনটাই আসেনি। ফাতেমীয় খলীফাদের নামে মাত্র শাসন বজায় থাকে ১১৭১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তার পরেই মিসরীয় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন প্রথমে নুরুদ্দিন জঙ্গী এবং পরে গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। কিন্তু সেটা পরের কথা, এবং পরে যথাস্থানে তা বিবৃত হবে।

ওদিকে ১০৫০ খৃস্টাব্দের দিকে এশিয়া মাইনরে দেখা দিল তুর্কিদের ক্রিয়াকান্ড। এই সব তুর্কিরা ছিল ইসলামে নব দীক্ষিত, প্রকৃত ইসলামী আদর্শ থেকে অনেকটাই দূরে। এই সব তুর্কিরা শক্তিতে ছিল প্রবল, ইচ্ছা করলে আব্বাসীয় মসনদ দখলও করতে পারত তারা। কিন্তু তা না করে বাগদাদী খলীফার আনুগত্য মেনে নিয়েই তারা সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ কাজে মনোযোগী হন। তাদের নেতৃত্ব ভূষিত হলো 'সুলতান' উপাধিতে। এশিয়া মাইনর ছিল তাদের কর্মক্ষেত্র। তাদের 'দৌরাত্ম্য' প্রতিরোধ করতে সম্রাট ডায়োজিনিস রোমেনাসের নেতৃত্বে কনস্ট্যান্টিনোপলের বিশাল বাহিনী

এগিয়ে এল। কিন্তু ১০৭১ খৃস্টাব্দে মানজিকার্টের যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলীয় সম্রাটের এ বিশাল বাহিনী পরাস্ত-পর্যুদস্ত হলো। এশিয়া মাইনরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তুর্কি সুলতানের আধিপত্য। এই তুর্কিরা সেলজুক তুর্কি বলে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। ফাতেমীয় খেলাফতের অবসানে জেরুজালেমের অধিকারও চলে আসে এই সেলজুক তুর্কিদের হাতে। কিন্তু ৬৩৮ খৃস্টাব্দে হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে জেরুজালেম মুসলিম অধিকারে আসার পর সেখানকার অমুসলিম অধিবাসীরা যেসব ধর্মীয় ও প্রশাসনিক উদারতা ভোগ করতে আরম্ভ করে, মুসলিম রাজতন্ত্রীয় শাসনামলের শেষ দিকে, বিশেষ করে তুর্কি শাসনামলে সে উদারতায় ঘাটতি দেখা দিল। সুদীর্ঘ কাল ধরে জেরুজালেম মুসলিম অধিকারে থেকে যাওয়ার জ্বালা তো খৃস্টানদের মনে ছিলই, সে অধিকারের শেষ দিককার শাসকবৃন্দের অনুদার ব্যবহার সেই জ্বালাকে আরও বাড়িয়ে দিল।

ইতোমধ্যে এশিয়া মাইনরে সেলজুক সুলতানদের শক্তিমত্ত উত্থান কনস্ট্যান্টিনোপলের শক্তিকে নিস্তেজ করে ফেলে। সেলজুক সুলতান আলপ-আরসালান কর্তৃক ১০৭১ খৃস্টাব্দে মানজিকার্দের যুদ্ধে গ্রীক সম্রাটকে নাস্তানাবুদ করার কথা আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তী সেলজুক সুলতান মালিক শাহর শাসনামলে (১০৭৩-১০৯২ খৃঃ) মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে কাশ্মীর থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, উত্তরে জর্জিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন কালে সেলজুক সুলতানদের উত্থান ও নানাবিধ কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য একদিকে যেমন মুসলিম সাম্রাজ্যে সুন্নী ইসলামের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করে, অন্যদিকে এশিয়া মাইনরে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অবসানের সূচনা করে।

এমনি অবস্থায় বাইজানটাইন সম্রাট আলেকসিয়াস কমনেনাস গ্রীক রোমান বা পূর্বাঞ্চলীয়-পশ্চিমাঞ্চলীয় খৃস্টান নেতৃত্বের পরস্পর অনৈক্যের কথা ভুলে গিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে রোমের পোপকে এশিয়া মাইনর পুনরুদ্ধারে তার সাহায্য কামনা করে বিনীত আবেদন জানান। সেটা ১০৯৪ খৃস্টাব্দে। এই আবেদনকে পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীক গির্জাসমূহের ওপর রোমের সর্বোচ্চ যাজক নেতৃত্বের প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন রোমের মহামান্য পোপ। এ প্রসংগে আরও যেসব বিবেচনা তার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল বলে আমরা মনে করি, সেসব বিবেচনা

স্বাভাবিকভাবেই ছিল পাশ্চাত্য বিরাজমান তখনকার বাণিজ্যিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং ধর্মীয় ও সর্বোচ্চ মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি।

স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতীচ্যের বিভিন্ন রাজ্য-সাম্রাজ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রাচ্য থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করত। এই প্রাচ্য বাণিজ্যই ছিল প্রতীচ্যের লাইফ ব্লাড বা প্রাণ রক্তের যোগানদার। এ বাণিজ্য বন্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থই ছিল জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য সেই প্রাণ রক্ত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বা তার স্বাভাবিক চলাচল মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়া। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী তথা মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়ে এবং স্বল্পকালের মধ্যে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ফলে প্রতীচ্যের সেই অপরিহার্য প্রাণ রক্তের অঞ্চলই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেল।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্য পথ ছিল তিনটি। মুসলিম শক্তির আবির্ভাবে এ তিনটি বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণই এসে গেল মুসলমানদের হাতে। আর তাতে অসুবিধায় পড়ল সমগ্র প্রতীচ্য। প্রতীচ্যের বাণিজ্য বলতে কিছুই আর রইল না, রইল শুধু মুসলমান বণিকদের কাছ থেকে মালামাল কিনে নিজেদের জনপদে পাইকারী ব্যবসা করা। এ কারণে মুসলিম শক্তির ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিল প্রতীচ্য।

'বর্বর'দের আক্রমণে বিধ্বস্ত রোমান সাম্রাজ্য প্রথম সামন্ততন্ত্র এবং পরে তারই নব বিন্যাস সৃষ্ট বিভিন্নরাজ্য গঠিত হলেও তার ছিল অসংগঠিত বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র মাত্র, উচ্ছৃঙ্খল পরস্পর বিচ্ছিন্ন তারুণ্যের বিভিন্ন সমাহার মাত্র।

ধর্মীয় দিক থেকেও প্রতীচ্য তখন অনেকটাই অনগ্রসর। প্রকৃতি পূজক জাতিসমূহ তখন সবেমাত্র খৃস্টধর্মের আওতায় এসেছে। আর প্রায় অশিক্ষিত খৃস্টান জন মণ্ডলী ইসলাম অনুসারীদের সুখ ও সমৃদ্ধির কল্প-কথা শুনে ঈর্ষায় জ্বলে মরছিল। আর ছোট বড় রাজধানীগুলোতে খৃস্টান নেতৃবৃন্দ তাদের সর্বব্যাপী অসামর্থকে আড়াল করার জন্য 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' হিসাবে বেছে নিয়েছিল ইসলাম অনুসারী রাজন্যবর্গকে। বহুকাল ধরে জেরুজালেম মুসলিম শক্তির হাতে এবং সে শক্তি একের পর এক গ্রাস করে নিচ্ছে খৃস্টান শাসিত জনপদ।

এমনি পরিস্থিতিতে রোমের মহামান্য পোপের' কাছে সম্রাট আলেকসিয়াসের নতিস্বীকারমূলক সাহায্য প্রস্তাবের ফলে এ বিষয়ে শেষ

সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব এসে যায় পোপ দ্বিতীয় আরবানের হাতে। এবং তার ফলে উপযুক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন পোপ দ্বিতীয় আরবান। সমগ্র খৃস্ট জগতের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হাতে পেয়ে মহামান্য পোপ ১০৯৫ খৃস্টাব্দের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর ইতালী ও দক্ষিণ ফ্রান্স সফর করে সেখানকার রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। অতঃপর ফ্রান্সের ক্লারমাউন্টে এক ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সময়টা শীতসঙ্কুল নভেম্বর হলেও শতাধিক খৃস্টান সম্প্রদায়ের হাজার হাজার উৎসাহী শ্রোতার তাঁবুতে তাঁবুতে ভরে যায় ক্লারমাউন্টের উন্মুক্ত প্রান্তর। যথাদিনে যথাসময়ে সেখানে নির্মিত উচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ভাষণ দান করেন খৃস্টজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহামান্য পোপ দ্বিতীয় আরবানঃ "হে ফ্রাক জাতির সন্তানেরা! এই মহান জাতি ঈশ্বর নির্বাচিত তাঁর এক প্রিয় জাতি। ... জেরুজালেমের চৌহদ্দি থেকে এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের আশপাশ থেকে প্রাপ্ত নিদারুণ দুঃখ সংবাদ এই যে, সেখানে অভিশপ্ত এবং পুরোপুরি ঈশ্বর বিরোধী এক জাতি খৃস্টানদের জনপদসমূহে হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে আসছে, আর লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনশূন্য করে দিচ্ছে সেসব জনপদকে। খৃস্টান বন্দীদের একাংশকে তারা নিয়ে যাচ্ছে নিজ দেশে, অন্যদেরকে হত্যা করছে নির্মম অত্যাচারের পর। তারা তাদের অশূচি নোংরামি দিয়ে কলুষিত করে দিচ্ছে গির্জাগুলোর পূজাবেদি। গ্রীক সাম্রাজ্য এখন তাদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে; এর মধ্যেই গ্রীকদেরকে তারা বঞ্চিত করেছে এমন এক ভূখণ্ড থেকে যার বিশালতা দু' মাসেও পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়।

কাদের ওপর ন্যস্ত আজ এই অত্যাচার-অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের ও খৃস্টানদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব? আপনাদের ওপর নয়? সেই আপনাদের ওপর— যাদেরকে ঈশ্বর দিয়েছেন অস্ত্রেশস্ত্রে, সাহসে-শৌর্যে আর শক্তিতে শত্রুর মাথা নত করে দেয়ার মত অসাধারণ গৌরব? আপনাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিকান্ড, সম্রাট শার্লেমেনের এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের গৌরব গাথা আজ আপনাদেরকে উৎসাহিত করুক। আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা যীশুর পবিত্র কবরভূমি আজ ওই অশূচি জাতির অধিকারে। এই অপ্রিয় সত্য আপনাদেরকে জাগ্রত করুক..... আপনাদের

সহায় সম্পত্তি যেন আপনাদেরকে পেছনে না টানে, পেছনে না টানে যেন আপনাদের পরিবার চিন্তা। যে জনপদে আপনারা বসবাস করছেন তা চারদিক থেকে সমুদ্র আর পাহাড় ঘেরায় আবদ্ধ। এত বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য তা খুবই সংকীর্ণ, সবাইকে খাদ্য প্রদানে যথেষ্ট নয়। তাই আপনারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন, এবং তারই পরিণামে অনেকে ধ্বংস প্রাপ্ত হন।

তাই আমার আবেদন আপনাদের মধ্য থেকে হিংসা, বিদ্বেষ দূরীভূত হোক, অবসান হোক সকল বিবাদ বিসম্বাদের। পবিত্র কবর ভূমির পথে শামিল হোন সবাই, দুষ্ট ধূর্ত সেই জাতির হাত থেকে হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করে তা নিজেদের করে নিন। জেরুজালেম হচ্ছে আমাদের সকল আনন্দের এক স্বর্গভূমি। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেই রাজকীয় নগরী আজ উদ্ধারের জন্য আপনাদের কাছে মিনতি জানাচ্ছে। সর্বপাপ মোচনের জন্য আপনারা সাগ্রহে তার পথে অগ্রসর হোন, আর স্বর্গরাজ্যে অক্ষয় বাসের গৌরব ও পুরস্কারের নিশ্চয়তা লাভ করুন।

ধর্মান্ধ দানবীয় শক্তির কানে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হলো খৃস্টান ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আরবানের উদ্দীপ্ত ঘোষণা। জেরুজালেমের পুনরুদ্ধারকল্পে অগ্রসরমান ক্রুসেডারদের ধর্মে যতক্ষন থাকবে ক্রুসচিহ্ন, ততক্ষণ তাদের জন্য থাকবে ইহলোকে আর্থিক সকল সুযোগের এবং পরলোকে স্বর্গলাভের নিশ্চয়তা। উদ্ধার কর পবিত্র জেরুজালেম!! God Wills it! মহামান্য পোপের এই বাণী শ্রোতামণ্ডলীর গগনবিদারী লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো God wills it ঈশ্বর এ-ই চান!!!... ১০৯৫ খৃস্টাব্দ। এগিয়ে চলল ক্রুসেড-বাহিনী।

জার্মান প্রফেসর মেয়ারের কথা, "Pope Urban 11 opened the council of Clermont on 18 November 1095 the moment that has gone down in history as the starting point of the Crusades... The moment which gave the council its special place in history came right at the end on 27 November. On this day the Pope was due to make an important speech". (The Crusades, Hans

Eberhard Mayer, 1972, p.9)। ১০৯৫ সালের ১৮ই নভেম্বরকে ইতিহাসে ক্রুসেডের সূচনা সময় বলে ধরা হলেও যে মুহূর্তটি আহুত কাউন্সিলের ইতিহাসে বিশেষ স্থান বলে চিহ্নিত হয়ে আছে, তা হচ্ছে ২৭শে নভেম্বরের শেষ লগ্ন। ওই লগ্নেই পোপ দ্বিতীয় আরবান তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সমবেত খৃস্টান শ্রোতামণ্ডলীর মনে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন প্রাচ্য-মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন। অতঃপর আরম্ভ হলো খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের সংগঠনের কাজ এবং সংগঠন শেষে ক্রুসেডের নামে, মানব-হননের জন্য অভিযাত্রার তারিখ নির্ণয়। এভাবেই ক্রুসেডাররা রক্ত দৃষ্টি নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। যদিও তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয় তবুও একের পর এক ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে।

সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী

ক্রুসেড বনাম ইসলামী জিহাদ

প্রাচ্য মুসলিমদের রাজ্য বিস্তার ও বাণিজ্য প্রাধান্যের প্রেক্ষাপটে খৃস্টান প্রতীচ্য সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আরবানের নির্দেশে যে সর্বাত্মক ক্রসেড আরম্ভ করে তার ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে ১০৯৬ সাল থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর। অবশ্যি, এর পরেও মুসলিম-খৃস্টানের মধ্যে ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোকে 'পরবর্তী ক্রুসেড' বলে সাধারণত আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ১০৯৬ থেকে ১২৯১ সালের ব্যাপ্তিতে ৯টি প্রধান ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যার কাল উল্লেখে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রফেসর আতিয়ার উল্লেখ অনুযায়ী (Crusade, Commerce and Culture, Aziz S. Atiya, Oxford University, 1962) উপরোউক্ত নয়টি ধর্মযুদ্ধের সময়কাল হচ্ছে- প্রথম ক্রুসেড: ১০৯৫-১০৯৯ সাল; দ্বিতীয় ক্রুসেড: ১১৪৬-১১৪৮ সাল; তৃতীয় ক্রুসেড: ১১৮৯-১১৯২ সাল; চতুর্থ ক্রুসেড: ১১৯৯-১২০৪ সাল; পঞ্চম ক্রুসেড: ১২১৭-১২২১ সাল; ষষ্ঠ ক্রুসেড: ১২২৮-১২২৯ সাল; সপ্তম ক্রুসেড: ১২৪৯-১২৫৪ সাল, অষ্টম ক্রুসেড: ১২৭০ সাল এবং নবম ক্রুসেড: ১২৯১ সাল।

দু'শ বছর ধরে চলমান এই ক্রুসেডগুলোকে ঐতিহাসিকগণ প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায় ১০৯৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত যার অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে প্রথম ক্রুসেডটি; দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেড নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়টি ১১৪৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত: এবং বাদ বাকি ক্রুসেডগুলোকে নিয়ে তৃতীয় পর্যায়টির বিস্তৃতিকাল হচ্ছে ১১৯৩ সাল থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রুসেড আরম্ভ হওয়ার সময়টাতে প্রাচ্যের মুসলিম রাজশক্তি এবং প্রতীচ্যের খৃস্টান রাজশক্তি উভয়ের অবস্থাই ছিল নড়বড়ে। বাগদাদ ভিত্তিক কেন্দ্রীয় খেলাফত বহু আগে থেকে তখন পর্যন্ত খুবই দুর্বল। তার বিপরীতে স্পেনে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খেলাফত ১০৩১ খৃষ্টাব্দে শুধুমাত্র বিলুপ্তই হয়নি, স্পেন থেকে মুসলমানদের অস্তিত্বের অবসানও ঘটেছে এবং মিসরে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমীয় খেলাফতও মোটেই সবল ছিল না। বাগদাদের আব্বাসী খেলাফতের মান-মর্যাদা তখন যথাসম্ভব বাঁচিয়ে

রেখেছে সেলজুক বংশের সুলতানেরা। ওদিকে প্রতীচ্যে খৃষ্টানদের কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বলতে তেমন কোন প্রকৃত শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। ছিল সামন্ত প্রথাভিত্তিক বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আত্মঘাতী কলহবিবাদ। বাইজানটাইন সম্রাট তখন আলেকসিয়াস কমনেনাস। কিন্তু তিনিও সেলজুকদের ভয়ে আতঙ্কিত। এমনি অবস্থায়ই সম্রাট কমনেনাস কর্তৃক সাম্রাজ্য রক্ষার্থে পোপের কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং তদানুযায়ী রোমের মহামান্য পোপ দ্বিতীয় আরবানের অগ্নিবর্ষী আবেগময়ী আহবানে আরম্ভ হয়ে গেল ক্রুসেড। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি নয়, কেন্দ্রীয় ধর্মীয় শক্তি হিসেবে খৃস্টান প্রতীচ্যে তখন পোপ সকলের কাছেই মহামান্য। ১০৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর পোপ বক্তৃতা দিতে গিয়ে, "In moving words the Pope called upon both rich and poor to help their Christian brothers the East. In this way peace might be restored to Christendom; there would be an end to fratricidal wars in Europe, to the opperession of widows and orphans and to the threats made against churches. and abbeys by a rapacious nobility. In denouncing what was, in effect a state of civil war, the Pope explained it in terms of the widespread poverty and malnutrition which resulted from inadequate cultivation of the soil. হৃদয়স্পর্শী শব্দমালায় পোপ পূর্বাঞ্চলীয় (ইউরোপের) খৃস্টান ভ্রাতৃবর্গকে সাহায্য করবার জন্য ধনী দরিদ্র উভয় শ্রেণীকে আহবান জানালেন। বললেন, এভাবেই খৃস্টান জগতে পুনঃস্থাপিত হবে শান্তি; অবসান হবে ইউরোপের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের, অবসান হবে বিধবা ও অনাথদের দুর্দশার এবং দূরীভূত হবে পরস্বাপহারী লোভাতুর অভিজাতদের দ্বারা চার্চ ও মঠসমূহের উপর আঘাতাক্রমণ। বস্তুত ঃ গৃহযুদ্ধের একটা পরিস্থিতির অবসান কামনা করে পোপ বিদ্যমান অবস্থাটাকে অপরিমিত চাষক্রমজাত বহুবিস্তৃত দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দ্বারা সাখ্যায়িত করলেন"।

এসব থেকেই প্রতীচ্যের অবস্থাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শক্তির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের পার্থক্যটা শুধু এ-ই ছিল যে, প্রাচ্যের মুসলিম উম্মায় পোপের মত কোন সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। এমনি অবস্থায়, ঐতিহাসিক গীবনের কথায়, 'খৃস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করে'। নড়বড়ে মুসলিম রাজশক্তিকে পরাস্ত করার উপরেও মুসলিম নিধনই ছিল ক্রুসেডারদের

প্রধানতম লক্ষ্য, যার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের দ্বারা এন্টিয়ক ও জেরুজালেম দখলের পর নির্মম গণহত্যায়।

ক্রুসেডের প্রথম পর্যায়ে ইটালি, ফ্রান্স, জার্মানীর ক্রুসেডারগণ, পিটার ও গডফ্রে, বলডুইন, বোহেমণ্ডের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনর দখল করে নেয়। অতঃপর ১০৯৮ সালে দখল করে নেয় এডিসা ও এন্টিয়ক এবং ১০৯৯ সালে জেরুজালেম। এন্টিয়কে খৃস্টান যোদ্ধারা প্রায় দশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে এবং অসংখ্য মানুষের ওপর চালায় অকথ্য অত্যাচার ও দানবীয় নির্যাতন, যাদের অধিকাংশই ছিল অসহায় মুসলিম নারী ও শিশু।

আর জেরুজালেম দখল করার পর? প্রফেসর মেয়ারের কথায়, "The governor and his retinue were the only Muslims to escape alive. The intoxication of victory, religious fanaticism, and the memory of hardships botted up to three years exploded in a horrifying bloodbath in which the crusaders hacked down everyone, irrespective of race or religion, who was unfortunate enough to come with in reach of their swords. They waded, ankledeep in blood, through streets coverd with bodies... The Muslim world was profoundly shocked by this christian barbarity; it was a long time before the memory of this massacre began to fade. গভর্নর ও তাঁর অনুচরবর্গ ছিলেন একমাত্র জীবিত পলাতক মুসলমান। বিজয়ের প্রমত্ততা, ধর্মীয় অন্ধ গোঁড়ামী এবং তিন বছরের অবরুদ্ধ কষ্টের স্মৃতি ফেটে পড়ল ভয়ঙ্কর এক রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে। যাতে ক্রুসেডাররা ফালি-ফালি করে কেটে ফেলল ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে—যারাই দুর্ভাগ্যক্রমে এসে পড়ল তাদের তরবারির নাগালের মধ্যে। শবদেহে আবৃত রাস্তা দিয়ে পায়ের গোড়ালি সমান রক্তধারা পেরিয়ে অতিকষ্টে তারা হেঁটে যেতে লাগল। ... এই খৃস্টান বর্বরতায় গভীরভাবে স্তব্ধবাক হয়ে গেল মুসলিম দুনিয়া, এই হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি মিলিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল"। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০)। মুসলিম নিধনের কী বর্বর দৃষ্টান্ত।

পুনরুদ্ধারকৃত জেরুজালেমের খৃস্টান শাসনকর্তা রাজা বলডুইন দখল করে নেন জাফা, আক্রা, সিডন ও বৈরুত, ১১০১ সালে। ১১০৯ সালে দখল করেন ত্রিপলি। খৃস্টানদের পুনরাধিকৃত এলাকায় নব বিন্যাসে গঠিত হয়

চারটি ল্যাটিন রাষ্ট্র এডিসা, এন্টিয়ক, ত্রিপলি ও জেরুজালেম। প্রথম পর্যায়ের বিজয়ী পক্ষ খৃস্টানেরা। তাদের এই বিজয় গৌরব অম্লান থাকে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত।

কিন্তু ১১৪৪ সালেই ঘটনা প্রবাহ বইতে থাকে উল্টো পথে। এডিসা দখল করে নেন সেলজুক নেতা ইমামুদ্দিন জঙ্গী। আরম্ভ হয় ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ের প্রথম থেকেই মুসলমানদের জেহাদ কালের সূচনাবলা যেতে পারে। কারণ, প্রথম পর্যায়ের প্রায় ৫০ বছর উম্মুক্ত দানবীয় চরিত্রের খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের কাছে পরাজিত, নির্যাতিত ও অপমানিত মুসলিম শক্তি তখন থেকে আবার জেগে উঠে দৃঢ় হাতে অস্ত্র চালিয়েছে নাসারাদের উপর। এই পর্যায়ের সূচনাকারী ফাতেমীয় খলীফার সাহায্যে এগিয়ে আসেন ইমামুদ্দিন জঙ্গী। ইমামুদ্দিন জঙ্গীর আহবানে মুসলিম যোদ্ধারা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। রুখে দাঁড়ায় ইসলামের নামে। আর খৃস্টানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় তারা আলেপ্পো, হারবান ও মসুল। বাগদাদের খলীফার নিকট থেকে আতাবেগ উপাধি লাভ করেন ইমামুদ্দিন জঙ্গী।

ধর্মযুদ্ধের স্রোত উল্টো বইতে আরম্ভ করেছে দেখে এক ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ইউরোপে। এর মধ্যে ১১৪৬ সালে ইমামুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যু হলে আলেপ্পোর মসনদে উপবিষ্ট হন তদীয় পুত্র নূরুদ্দীন জঙ্গী। ওই সময়টায় এডিসা আবার চলে যায় খৃস্টান অধিকারে। দ্বিতীয় ক্রুসেডের ঘোষণাকারী সেন্ট বার্নার্ডের আবেদনে জার্মানী ও ফ্রান্সের রাজন্যবর্গ এবং অন্যান্য সামন্ত ও নাইটরা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর হাতে পর্যুদস্তু হয়ে যায় খৃস্টান বাহিনী। এডিসা খৃস্টানদের হাত থেকে আবার কেড়ে নেন নুরুদ্দীন জঙ্গী। কেড়ে নেন এ যাবত হারানো অন্যান্য অঞ্চলও। বাকি থাকে শুধু জেরুজালেম।

১১৭৪ সালে নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর মুসলমানদের সপক্ষে ক্রুসেডের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন চিরস্মরণীয় যে বীর মুজাহিদ, তাঁর নাম গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী। জঙ্গী বংশের মাধ্যমেই তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অবস্থান গ্রহণ এবং মিসরের ফাতেমীয় খেলাফতের অবসানে তার সেখানকার স্বাধীন সুলতানরূপে কর্তৃত্ব গ্রহণ। তখন থেকেই মিসরে আবার খুৎবা পঠিত হতে থাকে বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফার নামে। ১১৭৫

সালে বাগদাদের খলীফা সুলতান সালাহউদ্দীনকে ফরমান দান করেন আল মাগরিব, মিসর, লিবিয়া, ফিলিস্তিন, পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্যএশিয়ার অধিপতিরূপে। ফলে, প্রাচ্যের মুসলিম শক্তির প্রধানতম পুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী, ইতিহাসে যিনি গাজী সালাহউদ্দীন নামে চির পরিচিত।

ক্রুসেডারদের ধর্মযুদ্ধের দানবীয় স্পৃহাকে ধ্বংস করে দেয়াই ছিল সুলতান সালাহউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ অবদান। ১১৮৭ সালে হিত্তীনের যুদ্ধে তিনি খৃস্টান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সেই যুদ্ধেই বন্দী হয় জেরুজালেমের রাজা গী দ্য লুসিনান এবং মক্কা মদীনাকে ধ্বংস করার অভিলাষী খৃস্টান নেতা রেজিনাল্ড। লুণ্ঠন বৃত্তির অপরাধে এবং সন্ধিচুক্তি অবমাননার দায়ে এই মহাপাতকী রেজিনাল্ডকে দেয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সসম্মানে মুক্তি দেয়া হয় রাজা গী দ্য লুসিনানকে। এর পরপরই জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে নেন সুলতান গাজী সালাহউদ্দিন।

ক্রুসেডের ইতিহাসে গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী মুসলিম শক্তির দিক থেকে সর্বোত্তম প্রশংসার দাবিদার এজন্য যে, ক্রুসেডের প্রথম পর্যায়ে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত মুসলিম শক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে সত্যিকার জেহাদে অবতীর্ণ হয় যার সুযোগ্য নেতৃত্বে, তিনি এই গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী। ১১৬৭ খৃস্টাব্দে মিসরের অযোগ্য ফাতেমী খলীফা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার শাসনকর্তা নূরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্য চাইলে সেই সুবাদে সালাহউদ্দীন ইউসুফ তার পিতৃব্যের সঙ্গে মিসরের বাহিনীতে এসে যোগ দেন। মিসর থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়নের পর খলীফা সালাহউদ্দীনকে সেনাধ্যক্ষ এবং তাঁর পিতৃব্যকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ক্রুসেডে বিপর্যস্ত মুসলমান তথা ইসলামের অবস্থানকে সুরক্ষিত করার মানসেই জ্ঞানার্থী সালাহউদ্দীন ইউসুফ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মিসরে এসেছিলেন এবং মিসরে সেনাধ্যক্ষের নিযুক্তি পেয়ে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পথ পরিক্রমায় অগ্রসর হন।

১১৭৪ খৃস্টাব্দে নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর সিরিয়ার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সেখানকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন সালাহউদ্দীন ইউসুফ আইয়ূবী। অতঃপর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যথার্থ শক্তির অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে তিনি ফাতেমী খলীফার পরিবর্তে আব্বাসীয় খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে

নিজেকে সিরিয়ার সুলতান বলে ঘোষণা করেন। আব্বাসীয় খলীফাও তাঁকে আল-মাগরিব, মিসর, সিরিয়া লিবিয়া, প্যালেস্টাইন, পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার অধিপতি বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তারপর মুসিল ও মেসোপোটেমিয়াও তার অধিকারে এসে যায়। ক্রুসেডারদের অধিকারে থেকে যায় জেরুজালেমসহ এই বিশাল এলাকার আরও অনেক স্থান। সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী এসব ক্রুসেডারদের মুকাবিলায় অগ্রসর হন। ১১৮৭ খৃস্টাব্দে হিত্তীনের প্রান্তরে বিধ্বস্ত করে দেন ক্রুসেডার ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে। বন্দি হন প্যালেস্টাইন রাজা গী দ্য লুসিনানও পাদরী নেতা রেজিনাণ্ড। কিন্তু বিজয়ী সালাহ্ উদ্দীন মুক্তি দেন রাজা গী দ্য লেসিনানকে কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন পবিত্র মক্কা মদীনা ধ্বংসের ঘোষণাকারী চরম অত্যাচারী রেজিনাল্ডকে। তারপর অগ্রসর হন জেরুজালেম পুনরুদ্ধারে এবং সপ্তাহব্যাপী সফল অবরোধের পর খৃস্টানদের হাত থেকে উদ্ধার করেন প্রায় নয় দশক ধরে হারানো জেরুজালেমের ওপর মুসলিম অধিকার। গাজী রূপে অভিহিত হন সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ুবী।

জেরুজালেমের পতনে খৃস্টান প্রতীচ্যে আরম্ভ হয় তৃতীয় ক্রুসেডের প্রস্তুতি। ইংল্যাণ্ডের রাজা সিংহ-হৃদয় রিচার্ড, জার্মানীর রাজা ফ্রেডারিক এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাষ্টাসের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে এক বিশাল খৃস্টান বাহিনী। অগাষ্টাস ধর্মযোদ্ধাদের টায়ারে একত্রিত করে আক্রার দিকে অগ্রসর হন, আর রিচার্ড জেরুজালেম অবরোধ করেন। কিন্তু খৃস্টানদের পক্ষে জেরুজালেম দখল করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় ১১৯২ সালে রিচার্ড একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে স্বদেশে ফিরে যান।

এখানে উল্লেখ্য যে, খৃস্টান বাহিনী প্রতিটি বিজয়ের পর যে গণহত্যা সম্পন্ন করে আসছিল, মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে কোথাও তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৯২ সালে রিচার্ড সালাহউদ্দীনের মধ্যেকার চুক্তি অনুসারে অ-মুসলিম খৃস্টান ইহুদী তীর্থযাত্রীরা মুসলিম অধিকৃত জেরুজালেমে তাদের ধর্মীয় স্থানগুলো পরিদর্শনের অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে। সুলতান সালাহউদ্দীন গাজীর মৃত্যু হয় ১১৯৩ সালে। এভাবে সমাপ্ত হয় ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে বিজয়ী পক্ষ ছিল মুসলমানরা।

১১৯৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ক্রুসেডের যে তৃতীয় পর্যায়, তাতে জয়-পরাজয় দু'পক্ষেরই ভাগ্যে জোটে, কিন্তু এ পর্যায়ে

ক্রুসেডের তীব্রতা যায় কমে। তাছাড়া খৃস্টান ও মুসলমান এই দুই পক্ষ ছাড়াও প্রায় শতবর্ষের এই তৃতীয় পর্যায়ে অন্যান্য ঘটনাক্রমও এতে সংযোজিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রিচার্ড সালাহউদ্দীনের শান্তিচুক্তি অনুসারে খৃস্টানরা জেরুজালেমের মূল রাজধানী হারিয়ে আক্রায় স্থাপন করে তাদের রাজধানী। এই তৃতীয় পর্যায়ের যে ক্রুসেড ও জেহাদ তার রুপরেখা হচ্ছে-গাজী সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর পর ১১৯৫ খৃস্টাব্দে রোমের পোপ তৃতীয় সেলেষ্টাইন চতুর্থ ক্রুসেড আরম্ভ করেন। ক্রুসেডাররা সিসিলি দখল করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলে গাজী সালাহউদ্দীনের পুত্র আদিল তাদের গতিরোধ করেন। ১১৯৮ খৃস্টাব্দে তারা সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ৩ বছর পর পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে পঞ্চম ক্রুসেড ঘোষণা করেন তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ড ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য রাজপরিবারের সদস্যগণ। কিন্তু সিরিয়া থেকে যায় মুসলমানদের অধিকারেই। ১২১৬ খৃস্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট সূচনা করেন যে ষষ্ঠ ক্রুসেড, তাতে দুই লক্ষাধিক খৃস্টান ধর্মযোদ্ধা সিরিয়ার পথে অগ্রসর হয়। সেই সূত্রে খৃস্টান ধর্মযোদ্ধারা মিসর ও ডালমেটিয়া গমন করে প্রায় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) মানব সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এরপরেও তারা পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়ে ১২২১ খৃষ্টাব্দে মুসলিম মুজাহিদদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সপ্তম ক্রুসেড শুরু হয় ১২৩৮ খৃস্টাব্দে রোমের মহামান্য পোপ সপ্তম গ্রেগরীর প্ররোচনায়। এখানে মুসলিম নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে।

এদিকে গাজী সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং যথারীতি আরম্ভ হয় গৃহযুদ্ধ। তারই সুযোগে গাজী সালাহউদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মালিক আদিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সিরিয়া, মিসর ও ইরাকে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তার মৃত্যুর পর মসনদে আরোহণ করেন তদীয় পুত্র আল কামিল। এই আল কামিলই সপ্তম ক্রমে, সকালে জেরুজালেম ছেড়ে দেয় খৃস্টানদের হাতে। খৃস্টানরা ১২৪৪ সাল পর্যন্ত রক্ষা করে চলে জেরুজালেমের অধিকার। কিন্তু আল কামিলের পৌত্র আস সালিহ খাওয়ারিযমে তুর্কিদের সাহায্যে ১২৪৪ সালে অষ্টম ক্রুসেড ও জেহাদ শুরু হয়। অবশেষে নবম ও শেষ ক্রুসেডে ১২৯১

সালের মধ্যে মুসলিম বাহিনী আক্রাসহ সকল খৃস্টান অধিকৃত সকল রাজ্যই দখল করে নেয়। এভাবে আপাত সমাপ্ত হয় খৃস্টানদের পরিচালিত ক্রুসেড।

খৃস্টান প্রতীচ্য যখন ক্রুসেড আরম্ভ করে, তখন তার অবস্থা এমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল যে তার থেকে কোন রকমে বাঁচার জন্য ক্রুসেড জাতীয় কোন কার্যক্রমের আশ্রয় নেয়া ছিল অপরিহার্য। জার্মান প্রফেসর মেয়ারের ভাষায় "Indeed on the eve of the Crusades Europe was caught up in fierce internecine struggles. প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেডের পূর্বক্ষণে পারস্পরিক প্রচণ্ড ধ্বংসকারী সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ। (The Crusades, H. E. Mayer, 1972. p. 2) ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত তখন সামন্ত প্রথা। খৃস্টীয় যাজকতন্ত্রও সেই সামন্ত্রতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। শিক্ষাবিহীন কলূষিত সামন্ত প্রথার প্রচলনে ইউরোপে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান তখন চরম অরাজকতা। সামন্তদের বিপথগামী স্বেচ্ছাচারী সন্তানেরা পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে নিয়োজিত। তদুপরি, প্রতীচ্যেরই পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ছিল আভিজাত্যজনিত পার্থক্যরোধ এবং অন্তর্বিরোধ। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অজ্ঞানতাজাত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অতলে নিমজ্জিত ক্রুসেডকালীন প্রতীচ্যের অন্তর্বিরোধের কথা প্রসঙ্গে প্রফেসর মেয়ারের মন্তব্যঃ "The cultural differences between the Greek speaking East and the Latin West too great for the unity of Christendom to survive for long. খৃস্টবাদের একতা বেশিদিন ধরে টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রীকভাষী পূর্বাঞ্চল ও ল্যাটিন পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য ছিল অনেক বেশি।"

মুসলিম শক্তি প্রতীচ্যের প্রান্তভাগে রাষ্ট্রীয় এবং বাণিজ্যিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় ইউরোপ তথা প্রতীচ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সেখানে এমন কোন প্রবল রাজশক্তিও আর বিদ্যমান ছিল না যা প্রতীচ্যকে, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউরোপকে, কোন এক পরিকল্পিত লক্ষ্যের পানে পরিচালিত করতে পারত। ধর্মীয়ভাবে খৃস্টীয় যাজক শক্তিই তখন সাধারণভাবে গৃহীত একমাত্র শক্তি। তাই প্রতীচ্যের 'মহামান্য' পোপই সকল অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে খৃস্টান জগতকে বাঁচাবার তাকিদে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের ডাক দিলেন। তাতে যোগ দিল, ঐতিহাসিকদের মতে,

ইউরোপের পাপাচারী বর্বর অশিক্ষিত ও স্বর্গলাভেচ্ছু লোকেরা। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন; "ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খৃস্টান প্রতীচ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। নিজেদের সকল দূর্দশা, সর্বপ্রকার অধঃপতনের জন্য দায়ী করা হলো মুসলিম শক্তিকে। ক্রুসেড চলল বহুদিন ধরে; বহুদিন ধরে চলল কাউন্টার ক্রুসেড বা জেহাদ। পোপের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। নানা চড়াই-উৎরাইর মধ্যদিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হলো প্রাচ্যের মুসলিম শক্তিই।

এসব ক্রুসেড কাউন্টার ক্রুসেডের ফলাফল হলো বিভিন্নমুখী এবং ফলাফল বিচারে দেখা যায় পরিণামে অযোগ্য-পীড়িত শেষ বিজয়ীদের চাইতে বিজিতদের লাভই হয়েছে বেশি। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপের নির্দেশে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত যাজক শ্রেণীর কলঙ্কময় ইতিহাসে পরিণত হয়। মানুষের জ্ঞানোন্মেষের আলোতেই যাজক শ্রেণীর পরিচয় অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে। ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারীরা মুসলিম প্রাচ্যের উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং উদ্বুদ্ধ হয় উন্নততর জীবন ধারা লাভের আশায়। ক্রুসেডের ফলেই প্রাচ্য সম্পর্কে প্রতীচ্য লাভ করে চাক্ষুস সম্যক উচ্চতর জ্ঞান এবং কালক্রমে প্রাচ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের ও বাণিজ্যের প্রসারতার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

ক্রুসেডের ফলে ইউরোপবাসী মুসলমানদের নিকট থেকে লাভ করে মেরিনার্স কম্পাসের ব্যবহার, সুগন্দি দ্রব্য-মসলাদি, উন্নতমানের কৃষিপদ্ধতি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তারা প্রাচ্য দেশীয় সম্পদের চাহিদা সৃষ্টিতে অবদান রাখে। হিট্রি বলেন ঃ "প্রাচ্যের অপেক্ষাপ্রতীচ্যের জন্য ক্রুসেড ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ"। খৃস্টানদের ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার অনেক উপকরণের অনুপ্রবেশ"। ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন: "ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্ম লাভ করেছে।"

সুদীর্ঘ ক্রুসেডকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীচ্যবাসী নিজেদের অভাবগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে সেসব অভাব দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করল তারা। এই অনুভবই তাদেরকে জাগিয়ে তুলল অশিক্ষা অজ্ঞানতা-অন্ধ বিশ্বাসের অতল থেকে। যা তাদের

নেই, তা-ই অর্জন করার দুর্জয় বাসনা জেগে উঠল তাদের মনে। ক্রুসেডে ব্যর্থকাম প্রতীচ্য এবার প্রাচ্য বাণিজ্যের নতুন পথ আবিষ্কারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কি করে প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছানো যায়, তা-ই হয়ে উঠল তাদের রাত-দিনের চিন্তা। "The Adventurous spirit of the cross-bearers ultimately brought forth the age of exploration and discovery ক্রুসেডারদের দুঃসাহসী স্বভাবই শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানী ও আবিষ্কার যুগের জন্ম দেয়"। (Crusade, Commerce and Culture, Aziz S. Atiya; Oxford University Press, (1962 P. 1227)।

ক্রুসেডের তৃতীয় পর্যায়ে মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে প্রতীচ্যের খৃস্টান শক্তি দুর্দান্ত মোঙ্গল বাহিনীকে প্ররোচিতে করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মোঙ্গল অধিপতি খৃস্টানদের এসব চালাকিতে ধরা দিতে চাননি। তাই বলতে হয়, শেষ পর্যন্ত অন্য শক্তির সাহায্যে মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার আশা আর থাকল না খৃস্টানদের। থাকল শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জিভূত আক্রোশ। তাদের খুনে-বাসনার জোয়ারে এল ভাটার টান। কিন্তু ততদিনে যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সঞ্চারিত হয়েছে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদের নবতর গতি। প্রফেসর আতিয়ার কথা, "On close investigation the Counter-Crusade is revealed as a perfect counterfoil and an equal peer to the Crusade, with only one major difference that the later left its permanent impression on the Course of history, whereas the Tormer culminated in irrevocable bankruptcy. সযত্ন নিরীক্ষায় কাউন্টার-ক্রুসেড (জেহাদ) ক্রুসেডের সমুচিত ও সমকক্ষ জবাব হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে, দুয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য একটাই এবং তা হচ্ছে এই যে, পরবর্তীতে (অর্থাৎ কাউন্টার-ক্রুসেড) ইতিহাসের গতিপতে রেখে গেছে তার স্থায়ী প্রভাব, অথচ প্রথমটির (অর্থাৎ ক্রুসেডের) পরিণতি ঘটেছে অপরিবর্তণীয় দেউলিয়াত্বে"। (Crusade, Commerce and Culture, Aziz S Atiya, Oxford University Press, 1962, P.130)

ক্রুসেডের শেষ ঘটনা ছিল ১২৯১ সালে খৃস্টান অধিকৃত আক্রার পতন। ১১৮৭ সালে মুসলিমরা পুনরুদ্ধার করেছিল জেরুজালেম, আর তার প্রায় একশ' বছর পর মুসলিম, মুজাহিদরা আবার দখল করে নিল খৃস্টানদের জেরুজালেম-স্বপ্নের শেষ মনযিল আক্রা। "When an Italian, Martoni,

visited Cyprus in 1394 he noticed that when the noble ladies went out of doors they wore long black garments which revealed only their eyes. When he asked for an explanation of this custom, he was told that it was a token of mourning for the loss of the city of A cre in 1291. মার্টনি নামে এক ইটালিবাসী ১৩৯৪ সালে যখন সাইপ্রাস পরিদর্শনে যান, তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে অভিজাত বংশীয় মহিলারা ঘরের বাইরে যাবার কালে কালো লম্বা পোশাকে এমনভাবে আবৃত থাকেন যাতে তাদের চোখ দু'টি মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এই রীতির ব্যাখ্যা চাওয়াতে তাকে বলা হয় যে, ১২৯১ সালে আক্রানগরী হারানোর শোক-প্রতীক হিসাবেই এর প্রচলন"। (The Crusades. Hans eberhard Mayor, Oxford University Press 1972, p-274)। জেরুজালেম ও আক্রা হারিয়ে ব্যর্থ খৃস্টান স্বপ্ন নৈরাশ্যের অন্ধকারে তলিয়ে গেল। অভিজাত পরিবারের খৃস্টান রমণীদের দেহ ও মুখাবয়ব কালো লম্বা পোশাকে আবৃত রেখে এই বেদনা ও নৈরাশ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিত সমগ্র খৃস্টান সমাজকে। খৃস্টান সমাজ কোন দিন ভুলতে পারেনি জেরুজালেমকে।

১২৯১ সালে আক্রা পুনরুদ্ধার করেছিলেন মিসরের মামলুক সুলতান আল আশরাফ খলীল। খৃস্টানদের দখলী কৃত জনপদসমূহ পুনরুদ্ধার করে যুদ্ধংদেহী মামলুক বীরবৃন্দ হানা দেন পার্শ্ববর্তী এশীয় ও লেভান্টীয় খৃস্টান অধিকৃত রাজ্যসমূহে এবং তা দখলও করে নেন। ১৩৬৫ সালের পর থেকে মিসরীয় মামলুক সুলতানগণ গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী। খৃস্টানগণ তখন দীর্ঘ সময় ধরে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনি পরিস্থিতিতে কিছুকাল পর ঝিমিয়ে পড়া মিসরীয় শক্তির স্থান দখল করে কাউন্টার-ক্রুসেড বা জেহাদের পথে দৃঢ়পায় এগিয়ে আসা নবোত্থিত অটোম্যান তুর্কি শক্তি। বাইজানটাইন শক্তির শেষ দুর্গ ধসে পড়ে তুর্কিদের প্রবল হুঙ্কারে। ১৪৫৩ সালের ২৯শে মে তুর্কিরা দখল করে নেয় হাজার বছরের বাইজানটাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। দুর্নিবার এক নৌশক্তিরূপে গড়ে উঠেছে তখন তুর্কিদের দুরন্ত বাহিনী। ইউরোপের এক অংশবিশেষ তাদের শক্তি হয়ে উঠেছে ইউরোপীয় খৃস্টানদের জন্য এক ত্রাসের কারণ। সুলতান সুলায়মান তখন প্রতীচ্যের সামুদ্রিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মাথা গলাতে আরম্ভ করেছেন। শুধু প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও অন্যতম শক্তি তখন তুরস্ক।

দখল-বেদখলের পর আক্রাসহ জেরুজালেম বা বাইতুল মুকাদ্দাস ১২৯১ সালের মধ্যে মুসলিম নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পোপ ঘোষিত ক্রুসেডের ইতি হয় তখনই। কিন্তু তারপরেও নবতর রূপে চলতে থাকে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যে যুদ্ধ, তাকে ক্রুসেডই তো বলা যায়। কেউ কেউ সেগুলোকে 'পরবর্তী ক্রুসেড' বলে অভিহিত করে থাকেন। এ সংজ্ঞাটিকে সঠিক বলে মেনে নিলে বলতে হয়-চৌদ্দ শত কুটি এই 'পরবর্তী ক্রুসেডের' ডামাডোলে ছিল বেশ হতচকিত। তখন মুসলিম শক্তির ধারক হয়েছে তুরস্ক। পনের শতকও ক্রুসেডবিহীন ছিল না। তবে এই পনের শতকে ক্রুসেড তার প্রকৃতি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং এক 'পরিত্যক্ত' বিষয়ে পরিণত হয়।

১৩৯৬ সালে সংঘটিত নাইকোপোলিসের যুদ্ধই 'পরবর্তী ক্রুসেডের' শেষ যুদ্ধ। উদীয়মান তুর্কি শক্তির বিরুদ্ধে,বলতে কি তুর্কি শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করতেই ইউরোপীয় খৃস্টান শক্তি এগিয়ে এসেছিল। নাইকোপোলিসের যুদ্ধে উভয়পক্ষে এক লাখ করে সৈন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। ইউরোপের সকল রাজ্যই অংশগ্রহণ করেছিল এই যুদ্ধে। অন্যদিকে তুরস্ক সুলতান প্রথম বায়েজিদের নেতৃত্বে ছিল লাখো সৈন্যের এক তুর্কি বাহিনী। খৃস্টানদের যুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণের জন্য। কিন্তু সভায় সে উপদেশ কোন পাত্তা পায় নি। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র তুর্কি সাম্রাজ্য দখল করে পারশ্য সাম্রাজ্যসহ 'পবিত্র ভূমি' করায়ত্ত করে নেয়া। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এই ক্রুসেডে এসেছিল। সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক কৌশল তারা গ্রহণ করতে যাবেন কেন?

যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথমদিকে প্রতীচ্য বীরবীক্রমে শত্রু নিপাত করে এগোতে লাগল। আর পালাতে আরম্ভ করল তুরস্ক বাহিনীর সৈন্যরা এবং পালাতে লাগল পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে। তাদের পেছনে ধাবমান রক্তপিপাসু ক্রুসেডারগণ। কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চলে তুরস্ক বাহিনীকে ধাওয়া করতে গিয়ে তাদের দম শেষ হয়ে আসতে লাগল। তবু বিজয়ের শেষক্ষণে তারা এগিয়েই যেতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়াল।

পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের সামনে মুক্ত অস্ত্র হাতে অবস্থান গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে সুলতান বাহিনীর একাংশ, চল্লিশ হাজার যোদ্ধার এক দুর্জয় বাহিনী। এতক্ষণের যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করেনি। সম্পূর্ণ সতেজ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এক মুজাহিদ বাহিনী। মুহূর্তে দিক পরিবর্তন হলো খৃস্টান বাহিনীর। কিন্তু যাবে

আর কোথায়? মুহূর্তে পরিবর্তিত হলো রণাঙ্গনের দৃশ্যপট। ধাবমানকারীরা হলো পশ্চাদ্ধাবিত। ক্রুসেডারদের দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল নাইকোপেলিসের রণাঙ্গন। পুরাপুরি বিধ্বস্ত হলো প্রতীচ্যের খৃস্টান বাহিনী।

"The news of the catastrophe overwhelmed Europe with deep sorrow and dismay; and the grim fate of the chivalry of the West at Nicopolis marked the end of one chapter and the beginning of another in the relation between the East and the West. The prospect for the crusade became dimmer every day, and the Turks had to be accepted as a member of the European Common wealth of Nations despite of their race and religion. এই বিপর্যয়ের খবর ইউরোপকে গভীর দুঃখ ও আতঙ্কে আচ্ছন্ন করে দিল; এবং নাইকোপোলিসে প্রতীচ্য শৌর্যের এই কঠোর করুণ ভাগ্যবরণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্কে সূচনা করল একটি যুগের অবসান এবং অন্য এক যুগের আরম্ভ। ক্রুসেডের আশা ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল প্রতিদিন এবং জাতি-ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও তুর্কিদেরকে গ্রহণ করে নিতে হলো ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের এক সদস্য হিসাবে। (Crusade, Commerce and Culture, Aziz S. Atiya, Oxford University Press, 1962. p. 110)

তুর্কি সাম্রাজ্য অতঃপর বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে। আড্রিয়ানাপোলের পর বাইজানটিয়ামে স্থাপিত হয়েছে তুর্কি মুসলিমদের রাজধানী এবং ১৪৫৩ সালের পর কনস্টান্টাইনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তুরস্ক সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ও তার বংশধরেরা। মোরিয়া ও আর্কিপেলেগোসহ আশেপাশের ল্যাটিন পকেটগুলো অন্তুর্ভুক্ত হলো তুর্কি সাম্রাজ্যে। তারপর তার বিজয় অভিযান পরিচালিত হলো পূর্ব মধ্য ইউরোপের পথে। ভিয়েনার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসে গেল তাদের অধিকারের সীমানা। "At last, when Egypt and the Holy land were subjugated by the Ottomans in the early years of the sixteenth century, their fate was henceforth bound up with that of a rising pan-Islamic realm whose ruler was simultaneously both Sultan and Caliph. অবশেষে, ষোল শতকের প্রথম বছরগুলোতে তুর্কিদের দ্বারা মিসর ও পবিত্র ভূমি যখন অধিকৃত হয়ে গেল। তখন থেকেই তাদের (তুর্কিদের) ভাগ্য স্থিরীকৃত হয়ে গেল উদীয়মান প্যান-ইসলামিক রাজ্যের সঙ্গে যার শাসক হয়ে উঠলেন

একাধারে সুলতান ও খলীফা (প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬১)। এশীয় শক্তিরূপে তুরস্ক তো পরিচিত ছিলই এবার তা পরিচিত হলো ইউরোপীয় শক্তি হিসাবেও। দৃশ্যত 'পরবর্তী ক্রুসেডের' সমাপ্তি এখানেই। ১৪৫৩ সালের ২৯শে মে তুর্কিরা দখল করে নেয় হাজার বছরের বাইজানটাইন রাজধানী। এবার ক্রুসেডের তৃতীয় পর্যায়কালে অন্যান্য জাতির এই খৃস্টান-মুসলিম সংঘাতে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আলোকপাত করা যেতে পারে। ১২৫০ সালে আইয়ূবী বংশের শেষ সুলতান তুরান শাহকে পরাজিত ও নিহত করে মামলুকগণ ক্ষমতা দখল করে। ওদিকে পারস্যের সেলজুকদের ধ্বংসের উপর বারো শতকের শেষদিকে গড়ে ওঠে খাওয়ারিযম সাম্রাজ্য। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামী প্রাচ্যের এই মুসলিম শক্তিটি মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বাহিনীর কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চিম দিকে আর্মেনিয়া-আজারবাইজানে এসে কোনরকম টিকে থাকে।

সালাহউদ্দীনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

সালাহউদ্দীনের শাসন নীতি ঃ সালাহউদ্দীন একজন প্রজাবৎসল শাসক ও দরিদ্রদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। প্রজাপীড়ন নয় বরং প্রজা পালনই ছিল তাঁর শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য এবং জীবনের ব্রত ছিল জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির ব্যবস্থা করা। তিনি এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন।

ধর্মপরায়ণতা ঃ তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক, সরল ও অনাড়ম্বর ছিলেন। তাঁর ধর্মানুরাগ এত বেশি ছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজ আদায় করতেন। তার ধর্মপরায়ণতা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি ধর্মকর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। প্রচুর ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি গরীবের মত জীবন যাপন করতেন। বিলাসিতা তাঁর চরিত্র বহির্ভূত ছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক সালাহউদ্দীন জ্ঞানী-গুণী, ধার্মিক লোকদের সমাদর করতেন। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজদরবার অলংকৃত করতেন। তাঁর মন্ত্রিসভার উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল আলকাজ ও ইমামউদ্দিন, আল কাতিব, আল ইস্পাহানী তাঁর জীবনী রচয়িতা বাহাউদ্দীন ইবনে সাদ্দাদ তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারী ছিলেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের চিকিৎসাশাস্ত্রে নিজেদের অবদান যুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল পূর্ববর্তী বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থসমূহ আরবী-সিরিয়াক প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ। নিজস্ব উদ্যোগ ও সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ট পোষকতায় ও এক দল অনুবাদক এ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। এতে মুসলমান ছাড়াও অংশ গ্রহণ করেছেন ইহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ ধর্মের বিশিষ্ট অনুবাদকগণ। একাজে কোন ভেদ টানা হতো না। মুসলিম শাসকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ও ধর্মীয় উদারতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। ধর্ম পৃথক হলেও প্রতিভা গুণে রাষ্ট্রীয় পরিপোষকতা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি। অন্যের কথা বাদ দিলেও ক্রুসেড যুদ্ধের মুসলিম নায়ক গাজী সালাহউদ্দীন নিজের চিকিৎসাবিদদের মধ্যে অধিকাংশই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়োগ দিয়েছিলেন।

নিম্নে বিশিষ্ট কয়েকজন অনুবাদকের নাম তুলে ধরা হলো ঃ

১. জুরজিস

২. হোনাযেন বিন ইসহাক

৩. ঈসাহাক বিন হোনাযেক

৪. হুবায়ন আল আসম

৫. ঈসা বিন ইয়াহিয়া বিন ইবরাহীম

৬. কুস্তা বিন লুফা বলোবাক্কী

৭. আইয়ুব আল মারুফ বিল আবরল

৮. ইসা বিন মাসারজিস

৯. শহীদ আল ফারখী

১০. মাসারজিস

১১. ইবনে শহীদ আল ফারখী

১২. আল হাজ্জাজ বিন মাতার

১৩. জারওয়া বিন মানাওয়া আননামী আল হিমসী

১৪. হিলাল বিন আবী হিলাল হিমসী

১৫. ফসীয়ুন আত তারজামান

১৬. আবু নসর বিন নারী বিন আইয়ুব

১৭. বাসিল আল মাতরান

১৮. ইসতাফান বিন বাসিল

১৯. মূসা বিন খালেদ

২০. ইসতাছ

২১. জিরুন ইবনে রাবিতা

২২. তদরস আস সনকল

২৩. সারজিস আর রাসী

২৪. আইয়ুব আর রাহাবী

২৫. ইউসুফ আন নাকেল

২৬. ইবরাহীম বিন সালাত

২৭. সাবেত আন নাকেল

২৮. আবু ইউসুফ আল কাতিব

২৯. ইউহান্না বিন বখতইস্ত

৩০. আল বাতরিক

৩১. ইয়াহিয়া বিন আল বাতরিক

৩২. কুস্তা আর রাহাবী

৩৩. মনসুর বিন বানাস

৩৪. আবদ্ ইস্ত বিন বাহারিজ

৩৫. আবু উসমান সাঈদ বিন ইয়াকুব আদ্ দামিস্ক

৩৬. আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন বকস

৩৭. আবুল হাসান আলী বিন ইবরাহীম বিন বকস

৩৮. শিরস্তয়া বিন কুতরুব

৩৯. মোহাম্মদ বিন মূসা আল মুনাজ্জম

৪০. আলী বিন ইয়াহিয়া আল মারূফ

৪১. ছাদরেস আল উসকাফ

৪২. মোহাম্মদ বিন মূসা বিন আবদুল মালেক

৪৩. ইসা বিন ইউনুছ আল কাতিব আল্ হাসিব

৪৪. আলী আল মারুফ বিল কাইয়ুম

৪৫. আহম্মদ বিন মোহাম্মদ আল মারূফ ইবনুল মোদাব্বের

৪৬. ইব্রাহীম বিন মোহাম্মদ বিন মূসা আল্ কাতিব

৪৭. আবদুল্লাহ বিন ইসহাক

৪৮. মোহাম্মদ বিন আবদুল মালেক জাইয়াত প্রমুখ।

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ তিনি জনহিতকর কার্যাবলী দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করে জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। কৃষির উন্নয়নের জন্য বহু খাল খনন করে মিসরকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যান। স্থাপত্য শিল্পে তার কৃতিত্ব খুবই প্রশংসনীয়। কায়রোর দুর্গ ও নগর প্রাচীর নির্মাণে তিনি ক্ষুদ্র পিরামিড হতে পাথর সংগ্রহ করেন।

সালাহ্উদ্দীনের মহানুভবতা ঃ মহানুভবতা, দেশপ্রেম, উদারতা সালাহ্উদ্দীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটে ওঠে। চরম শত্রুরাও তাঁর বদান্যতা, উদারতা ও মহানুভবতার প্রশংসা করেন। খৃস্টান যোদ্ধাগণ মুসলমানদের ওপর অমানবিক নির্যাতন করলেও সালাহ্উদ্দীন তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তিনি কোন খৃস্টান বন্দিকে হত্যা না করে বরং মুক্তি দেন। তৃতীয় ক্রুসেডে তিনি যে মহানুভবতা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান তা সত্যিই পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বীর যোদ্ধা ঃ গাজী সালাউদ্দীন আইয়ুবীর অসাধারন বীরত্ব ও সাহসিকতা তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্যে শামিল করেছে। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ বীরের মর্যাদা লাভ করেন বলে তাঁকে 'গাজী' উপাধি দেয়া হয়। ইসলামের ঘোর বিপর্যয়ের দিনে তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও সাংগঠনিক প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়ে তিনি শুধু ইসলামকে রক্ষা করেননি বরং এক ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করেন। তদানীন্তন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিত্রয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিরংকুশ বিজয়লাভের মধ্যে তাঁর সামরিক কৃতিত্ব ফুটে ওঠে।

স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ঃ স্থাপত্য শিল্পেও গাজী সালাহ্উদ্দীন কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। ১১৮৩ সালে নির্মিত কায়রোর দূর্গ তাঁর নির্মিত অবিস্মরণীয় স্থাপত্য কীর্তি। রাজধানীর নগর প্রাচীর নিমার্ণে তিনি ক্ষুদ্র পিরামিড হতে পাথর সংগ্রহ করেন।

বিদ্যোৎসাহী ঃ তিনি ছিলেন নিরহংকার ও বিদ্যোৎসাহী। মৃত্যুকালে তিনি মাত্র ৪৫টি দিরহাম এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান। সালাহ্উদ্দীন শুধু ক্রুসেডারদের জিঘাংসা মনোবৃত্তিকেই ধ্বংস করেননি বরং ইসলামকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে এর স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করেন। বিশ্ব ইতিহাসে

সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীর নাম প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে। তাকে মুসলমানের রক্ষাকর্তাও বলা চলে।

ক্রুসেড ও তার ফলাফল

ক্রুসেডের কারণ ঃ যে কোন ঘটনার পেছনে কোন না কোন কারণ বিদ্যমান থাকে। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের পশ্চাতে কতগুলো কারণ বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, মনস্তত্ত্বমূলক প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ নশংস ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল।

(১) জেরুজালেমের গুরুত্ব ঃ হযরত ওমরের শাসনামলে ৬৩৪ সালে আমর-ইবনুল-আস সর্ব প্রথম খৃস্টানদের নিকট হতে প্যালেস্টাইন অধিকার করেন। এটি যীশু খ্রিস্টের জন্মভূমি, মহানবী (সাঃ)-এর মিরাজ গমনের স্থান এবং মূসা ও দাউদ (আঃ)-এর বহু স্মৃতি বিজড়িত স্থান। কাজেই জেরুজালেম নগরী খৃস্টান, মুসলমান এবং ইহুদী-এ তিনটি সম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে পবিত্র।

(২) রোমীয় ও গ্রিক গির্জাদ্বয়ের দ্বন্দ্ব ঃ একাদশ শতাব্দীতে খৃস্টান ধর্মের রোমান গীর্জা ও গ্রিক গির্জার প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। রোমীয় ধর্ম গুরু পোপ সমগ্র খৃস্টান জগতে তাঁর প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন।

(৩) সামন্ত প্রথার বিষময় ফল ঃ একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সামন্ত প্রথা দেশে ভয়াবহ সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি করে। দেশের মজলুম জনসাধারণ এসকল জুলুমশাহী সহ্য করা অপেক্ষা তাদের কর্মশক্তি বিনিয়োগের জন্য পন্থা খুঁজছিল। অপর পক্ষে সামন্ত রাজাগণের কনিষ্ঠ পুত্রগণ ক্ষমতা ও সম্মান লাভের আশায় অধিক সংখ্যায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল।

(৪) বাণিজ্যিক কারণ ঃ ইউরোপের অর্থনৈতিক দুর্দশাও ক্রুসেডের অন্যতম কারণ। দশম শতাব্দী হতে মুসলমানগণ ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব লাভ করায় ইটালীর ভেনিস, পিসা, জেনোয়ার, ফরাসী বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে তারা রুদ্ধ বাণিজ্যদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার আশায় বাণিজ্য জাহাজ দ্বারা এবং টাকা-পয়সা সাহায্য দিয়ে ক্রুসেডে ইন্ধন যোগায়।

(৫) ধর্মীয় ও পার্থিব সুবিধা ঃ ক্রুসেডের পিছনে ধর্মীয় কারণের সাথে পার্থিব কারণও মিশ্রিত ছিল। যেমন- নতুন রাজ্য সৃষ্টি, ধন সম্পদ লাভ, পাপমুক্তি এবং বেহেশত লাভের আশ্বাস। ধর্মযুদ্ধের সময় খৃস্টান ধর্মযাজকগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে কর ও ঋণদান হতে মুক্ত এবং পাপমুক্তির আশ্বাস প্রদান করেন। অন্যদিকে মুসলমানগণও বেহেশত লাভের আশায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

গাজী সালাহউদ্দীন ও তৃতীয় ক্রুসেড ঃ সালাহউদ্দীন কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার হলে ইউরোপে তৃতীয় ক্রুসেডের উন্মাদনা জাগে। খৃস্টানদের সাহায্যে জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক, বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস বহু সংখ্যক ক্রুসেডারসহ জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য টায়ারে একত্রিত হয়ে আক্কা অবরোধ করে। এটা দখল করে ক্রুসেডারগণ আসকালানের দিকে অগ্রসর হয়। রিচার্ড আক্কা অধিকারের সময় নিষ্ঠুরতার সাথে প্রায় ২,৭০০ মুসলিম যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করলে সালাহউদ্দীন দ্বিগুণ সাহসে রিচার্ডের গতিপথ রোধ করেন। ফলে রিচার্ড বাধ্য হয়ে সালাহউদ্দীনের সাথে ১১৯২ সালে এক শান্তি সন্ধি স্বাক্ষর করে স্বদেশে ফিরে যান। অতঃপর গাজী সালাউদ্দীন ১১৯৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

তবুও ক্রুসেড থেমে থাকেনি

সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর উত্তরাধিকার ঃ ১১৯৩ সালে গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী মারা যান। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মৃত্যুর পূর্বে তিনি কোন উত্তরাধিকার নির্বাচন করতে পারেন নি। তাঁর সাম্রাজ্য তার তিন পুত্র মালিক-উল-আফজাল, আজিজ এবং জাইরের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। মালিক দামেশকে, আজিজ কায়রো, এবং জহির আলেপ্পোর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সালাহউদ্দীনের পুত্রগণ ও অন্যান্য সকল আত্মীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকায় নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ সুযোগে সালাহউদ্দীনের ভ্রাতা মালিক আল আদিল সিরিয়া, মিসর এবং ইরাকে স্বীয় প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর উত্তরাধিকারী এবং ক্রুসেডারদের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ ঃ গাজী সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর পরও ক্রুসেড থেমে থাকেনি। ক্রুসেডের তৃতীয় যুগ ছিল ১১৯৩ হতে ১২৯১ সাল পর্যন্ত। এ পর্যায়ে সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর উত্তরাধিকারী ও ক্রুসেডারদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। নিম্নে সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

চতুর্থ ক্রুসেড ঃ সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর দুই বছর পর পোপ তৃতীয় সেলেস্টাইন কর্তৃক চতুর্থ ক্রুসেডের সূচনা হয়। ১১৯৫ সালে ক্রুসেডারগণ সিসিলি দখল করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। তারা সালাহউদ্দীনের পুত্র আদিল কর্তৃক পর্যুদস্ত হয়ে ১১৯৮ সালে তাঁর সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে স্থির করা হলো যে, ৩ বছরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত থাকবে।

পঞ্চম ক্রুসেড ঃ কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে পঞ্চম ক্রুসেড ঘোষণা করেন। ইংল্যান্ডের রিচার্ড ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য রাজন্যবর্গ এ ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্রুসেডারগণ এবার সিরিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে বহু গ্রিক নর-নারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ষষ্ঠ ক্রুসেড ঃ ১২১৬ সালে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ষষ্ঠ ক্রুসেডের সূচনা করেন। তিনি প্রায় দু'লক্ষ ধর্মযোদ্ধা নিয়ে সিরিয়া গমন করেন। সেখান থেকে তারা মিসর লালমাটিয়া গমন করেন। সেখানকার ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলকেই নৃশংসভাবে ক্রুসেডার কর্তৃক হত্যা করা হয়েছিল। অতঃপর ১২২১ সালে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

সপ্তম ক্রুসেড ঃ ১২৩৮ সালে নবম গ্রেগরী সপ্তম ক্রুসেড প্রচার করেন। তাঁর প্ররোচনায় মালিক-উল-আদিলের পুত্র কামিল জার্মান সম্রাটের নিকট জেরুজালেম হস্তান্তর করলেও কামিলের পুত্র আইয়ূব ১২৩৯ সালে খৃস্টানদের নিকট হতে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন।

অষ্টম ক্রুসেড ঃ ১২৪৪ সালে ফ্রান্সের নবম লুইয়ের নেতৃত্বে খ্রিস্টানগণ অষ্টম ক্রুসেডের সূচনা করেন। কিন্তু তারা লুইয়ের নেতৃত্বে পরাজিত হন এবং তাদের নেতা লূই মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। মুসলমানদের সাথে

সন্ধি স্থাপন করে লুই মুক্তি লাভ করে দেশে ফিরে যান। অতঃপর মুসলমানগণ কৃতিত্বের সাথে সংগ্রাম পরিচালনা করে ১২৯১ সালের মধ্যে সকল জায়গা পুনরাধিকার করে নেন।

ক্রুসেডের আরো ফলাফল ঃ ক্রুসেডের ফলাফল ছিল ভয়াবহ। গীবনের মতে, ক্রুসেডসমূহ ইতিহাসের এক চরম ক্ষিপ্ততা পূর্ণ অধ্যায়। নিম্নে ক্রুসেডের ফলাফলসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

(১) ধ্বংসাত্মক পরিণতি ঃ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ছিল ধ্বংসলীলার প্রতীক স্বরূপ। ক্রুসেডের ফলে অসংখ্য মুসলমান প্রাণ হারায় এবং পশ্চিম এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকা এবং নগররাজি শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। অপরপক্ষে খৃস্টানগণ বিপুল ধন-সম্পদ এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েও মুসলমানদের হাত হতে পবিত্র ভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারেনি।

(২) সামন্ত প্রথার বিলোপ ঃ ধর্মযুদ্ধসমূহের ব্যয়ভার বহনের জন্য সামন্ত রাজাগণ তাদের ভূসম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হন কিন্তু যুদ্ধ শেষে তাদের কোন প্রকার আর্থিক লাভ না হওয়ায় বহু ব্যারন এবং নাইট দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং দেশে রাজকীয় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৩) শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ লাভ ঃ শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রুসেডের অবদান উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন, 'ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্ম লাভ করে।' এ সময় মুসলমানগণ শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল।

(৪) খৃস্টান ধর্মের প্রসার ঃ ক্রুসেডের ফলে খৃস্টান ধর্ম প্রচারের পথ প্রশস্ত হয়। এর ফলে মানুষের চিন্তা-ধারা প্রশস্ত হলে সমাজে পোপ ও খৃস্টান ধর্ম যাজকের ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব হয়।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার ঃ ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভূত উন্নতি হয়। তারা মুসলমানদের উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও শিল্প জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে এবং স্বদেশে ফিরে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

পরিশেষে ঃ পরিশেষে বলা যায় যে, গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণের সঙ্গে ক্রুসেডারদের বহুবিধ সংঘর্ষ হয়। এ সময় যদি সালাহউদ্দীন আইয়ূবী এবং ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ আবির্ভূত না হতেন তবে ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হত। তবে জেরুজালেম উদ্ধারসহ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ধর্মযুদ্ধ

সংঘটিত হয়। কাজেই মুসলমানদের নিকট ক্রুসেডের যুদ্ধ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

যে চরিত্র ভুলা যায় না

সুলতান সালাহ্উদ্দীন ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, সরল, নিরহংকার ও তাকওয়াপ্রবন শাসক। তিনি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সহজ-সরল, অনাড়ম্বর ও ধার্মিক। তাঁর ধর্মানুরাগ এতই অধিক ছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায়ও নামায আদায় করতেন। অর্থ-সম্পদের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি মাত্র ৪৫টি দিরহাম এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান।

অসাধারণ বীরত্ব, চরিত্র মাধুর্য, আচরণের মহানুভবতায় গাজী সালাহউদ্দীন নিঃসন্দেহে জগতের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর দুর্দিনে তার মত অসাধারণ সাহসী বীরপুরুষের আবির্ভাব না হলে হয়ত ইসলামের ভবিষ্যৎ ইতিহাস ব্যর্থতা এবং পরাজয়ের গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। তিনি ইসলামকে শুধু রক্ষাই করেননি, বরং এর ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করেছেন এটিই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। ইউরোপের চারণ কবি এবং আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণও তাকে একজন আদর্শ বীরপুরুষ বলে অদ্যাবধি তাঁর গুণকীর্তন করেন।

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় তিনি জিহাদে নিয়োজিত থাকলেও ছোটবেলার পাঠাভ্যাস কখনো ভুলেননি। সারা জীবনই তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। তিনি ছিলেন গভীর ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় তিনি তৃপ্তি পেতেন। সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ বীর হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন অহংকার ছিল না। সহকর্মীদের উদ্দীপ্ত করতে পারতেন তিনি সহজেই। তিনি ছিলেন মার্জিত, সংস্কৃতিবান ও ভদ্রজনোচিত ব্যক্তি। কোন ধরনের রূঢ়তা বা জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। সব সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। তবে প্রয়োজনে তিনি কঠোর হতে পারতেন। তার বদান্যতা, বিশ্বস্ততায় শত্রুরাও ছিলো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চরম শত্রু রাজা রিচার্ডও একাধিকবার সালাহউদ্দীনের দরদী হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বহু বিরল জ্ঞানের

অধিকারী ছিলেন। কায়রো এবং জেরুজালেম পুনঃগঠনে তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষ করে মসজিদুল আকসাকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করার পর তিনি মসজিদ হিসেবে প্রস্তুত করেন। দূর-দুরান্ত থেকে তিনি মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করে সুন্দরভাবে মসজিদটিকে সাজিয়ে ছিলেন।

তিনি কখনো নিজের ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত ভরসা করতেন না। শত্রু পক্ষেই প্রকৃত শক্তি এবং দুর্বলতা তিনি চুল-চেরা বিশ্লেষণ করতেন! নিজের অবস্থানও তার কাছে ছিল পরিষ্কার। মুসলিম বাহিনীকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি সফলও হয়েছিলেন। তবে তৃতীয় ক্রুসেডের সময় অনেক স্থান থেকে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাননি। প্রথম দিকে তিনি সফলও হয়েছিলেন। তার শক্তি বৃদ্ধিতে বাগদাদের খলীফাসহ অনেকেই ছিলেন ঈর্ষান্বিত। তবে তাদের অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও হতোদ্যম হননি তিনি। নিজের যতটুকু সামর্থ ছিল, তাই নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সফলও হয়েছিলেন।

যুদ্ধ জয়ের পরও তিনি ছিলেন শান্ত এবং সংযত। প্রতিশোধ নয়, ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য। মহৎপ্রাণ এই সুলতান বন্দি রাজা গাইকেও মুক্তি দিয়েছিলেন। এমনকি যুদ্ধবিন্দ নাইটদেরও মুক্তিপণের মাধ্যমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নাইট পরিবারগুলোকে অবাধে জেরুজালেমে ভ্রমণের সুযোগ দিয়েছিলেন। কাউকেই অন্যায়ভাবে দণ্ডিত করেননি। অথচ মাত্র ৯০ বছর আগে জেরুজালেম দখল করার পর খৃস্টানরা যে পাশবিক আচরণ করেছিল, তার দাগ তখনো ছিলো। তারা তখন জেরুজালেমের সকল মুসলমানকে হত্যা করেছিলে। মসজিদ মাদ্রাসাগুলোকে ধ্বংস করেছিলো। পাঠাগারগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সালাহউদ্দীন তার কোন প্রতিশোধই নেননি। এমনকি খৃস্টানদের পবিত্র স্থানগুলো পাদ্রীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য বাইতুল মুকাদ্দাস, ডোম অব রকসহ ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। তার ২৫ বছরের শাসনামল এক অন্যন্য সাধারণ ইতিহাস। এক ক্রান্তিলগ্নে তিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। বিশ্বের সকল স্থানের মুসলমানদের জন্য তিনি এক শ্বাশত আদর্শ হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

মুসলিম উম্মাহর অতীত গৌরব ও প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার এবং খৃষ্টান ও ইহুদী ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্য সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী সংগ্রাম করে গেছেন একাধারে। তিনি ছিলেন বীর পুরুষ, সাহসী এবং ইতিহাসের এক মহানায়ক। তাঁর সময়ে মুসলমানদের দুরবস্থা থেকে এবং খৃষ্টান চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করার মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে মুসলমানদের পুণর্জাগরন সৃষ্টিতে সফলতা লাভ করেন। মুসলমান জাতির শ্রেষ্ঠত্বও গৌরব চির দিনের জন্যে মুছে ফেলার ইচ্ছায় যখন খৃষ্টান শক্তি ক্রুসেড ঘোষনা করে তখন আমরা দেখতে পাই সালাহ্উদ্দীন আইয়ুবীর নির্ভিক নেতৃত্বে কি ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। তিনি ছিলেন সময়ের সাহসী সন্তান, বাতিলের আতংক। বাতিল শক্তি যখন কোন ভাবেই তাঁর সাথে কুলাতে পারেনি তখনই নারী ও মদ পরিবেশন করে মুসলিম সৈন্যদের হাত করার চেষ্টা করে। ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান।

ক্রুসেড বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ, নির্ভিক, পাহাড়সম ব্যক্তিত্বের অধিকারী, ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন, যুগান্তকারী চিন্তা নায়ক, অনন্য সাধারণ বাগ্মীতা এবং সুদুর প্রসারী দৃষ্টি মুসলিম জাতির ইতিহাসে সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীকে অমর করে রাখবে।

বিশ্ব ইতিহাসের এক তাৎপর্যময় অধ্যায় "ক্রুসেড" ছিল একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। খ্রিষ্টীয় ইউরোপ জেরুজালেম দখলের নামে মুসলিম-বিদ্বেষ সঞ্জাত দানবীয় তাণ্ডবলীলা চালায় এশিয়া-আফ্রিকার বুক জুড়ে বিশেষত ঃ মধ্যপ্রাচ্যে; ইতিহাসে সেটাই 'ক্রুসেড' হিসেবে খ্যাত হয়ে আছে। সে ট্রাজেডীর শেষ হয় ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের বিজয়ের মাধ্যমে। যার সিপাহ্সালার হলেন সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী। তাঁর বীরত্বের ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছে। অন্যান্য মুসলিম দেশে যে ইসলামী আন্দোলনের গণজোয়ার দেখা যাচ্ছে তাও তাঁরই বীরত্বের ফল বললে অতিরঞ্জিত হবে না।

একাদশ– ত্রয়োদশ শতকে ফিলিস্তিন ছিল তমসাচ্ছন্ন নিষ্প্রাণ অবস্থায়। ইহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা প্রবল ঝাকুনি দেয়ার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল একজন যুগ বিপ্লবীর। যার হাতে পরিবর্তন হবে যুগের হাওয়া, জাগরণ আসবে মুসলমানের তথা মুসলিম জাহানে আসবে রেনেসাঁ,

যার বদৌলতে সর্বত্র আসবে নব-জীবনের স্পন্দন। সে যুগ বিপ্লবী হিসেবে এবং রেনেসাঁ প্রবর্তনের শ্রেষ্ঠ নায়ক হিসেবে আমরা যাকে দেখতে পাই তিনি হলেন সুলতান সালাহ্উদ্দীন।

মহান আল্লাহ বলেন, "কোনো জাতি যে পর্যন্ত না তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন না।" (আল্ কুরআন)

ইতিহাসের এ অধ্যায়ে (ক্রুসেডকালীন) উপরোক্ত আয়াতে কারীমার পূর্ণ প্রতিফলন দেখতে পাই। মুসলিম জাতি যখনই তাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য জেগে উঠেছে তখনই তারা তাদের বিজয়ের লক্ষে পৌঁছতে পেরেছে। তার বাস্তব প্রমাণ বদর, অহুদের প্রথমাংশে, খায়বরের যুদ্ধে এবং বর্তমানকালের আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসী শক্তির মোকাবিলায় তালেবানদের বিজয়, আর ইরাকে আগ্রাসী বিরোধী তৎপরতা।

গাজী সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী উপরোক্ত আয়াতের আলোকে তাঁর জাতিকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পেরেছিলেন বলেই বিজয় তার হাতের মুঠোয় এসেছিল। তিনি নিজের স্বপ্নকে, স্থির বিশ্বাসকে রূপায়িত করেছিলেন নিজেকে কোরবান করে। তিনি তার জাতিকে কর্মচঞ্চল গতিশীল জীবনের দিকে চালনা করে ছিলেন, তার কর্মচঞ্চল জীবন যুগ যুগ ধরে মুসলিম জাতিকে জেগে তুলবে। যে কোন দেশে যে কোন জাগরনে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকবে। সকল সময়েই তিনি কর্মবীর হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন।

গাজী সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীর জীবন ছিল যেমন বৈচিত্র তেমনি কর্ম ও ছিল রোমাঞ্চপূর্ণ। তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপ না হলে "ক্রুসেড" নামক ট্রাজেডী মুকাবিলা সম্ভব হতো কি না বলা দুস্কর। স্বাধীন চিন্তাশীল সালাহ্উদ্দীন ছিলেন একজন অক্লান্ত কর্মীও, বিপ্লবী। অপূর্ব মনীষা ও বহুমুখী প্রতিভার জন্যে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। তাঁর তৈরী করা বিপ্লবের আগুন-শুধু ক্রুসেডারদেরই ভষ্ম করেনি তা শত শিখায় প্রজ্জলিত হয়ে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলিকে শক্তিশালী হতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। মুসলিম জগতের বর্তমান ঐক্য ও ক্রমবর্ধমান প্রাণশক্তির মূলে গাজী সালাহ্উদ্দীনের বিপ্লবী প্রচেষ্টা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। যুগের

চাহিদা অনুযায়ী দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের বারী সিঞ্চন করছে তাঁর বীরত্বের প্রভাব।

বস্তুত বিশ্বের মুক্তবক্ষে অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ বন্দি মানবের ব্যাথার দরদে যাঁদের প্রাণ কেঁদেছিল; স্বাধীনতা বঞ্চিত 'বন্দি নরের' রুদ্ধ কারাদ্বারে মুক্তির নামে যাঁরা বুকের তাজা খুন ঢেলে জীবন পাত করেছিলেন, তাদের মধ্যে গাজী সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীর নাম যুগে যুগে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকবে। এ ক্ষণজন্মা পুরুষ সিংহের জীবনেতিহাসের সাথে প্রাচ্য তথা সমগ্র মুসলিম জগতের রাজনৈতিক ইতিহাস অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সমগ্র খৃস্টান জগত যখন মুসলমানদের নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলতে চেয়েছিল, মুসলমানদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার চেষ্টা করেছিল, তখন গাজী সালাহ্উদ্দীন সঠিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বদৌলতে সমস্ত ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সকল দর্প চূর্ণ করে দেন। এ জন্য পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মানুষই ইতিহাসে অমরত্বের মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন– তাঁর মধ্যে তিনি অন্যতম। এরূপ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ খুবই বিরল। সত্যিই তিনি ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর প্রাণপুরুষ।

খৃষ্টান শক্তি পেশী শক্তির রণে ক্রুসেডের যুদ্ধে পরাজিত হলেও সে পরাজয়কে সাময়িক ভাবে মেনে নিয়েছিল। তারপরে তারা রেনেসাঁস বলে তথাকথিত 'মেধা শক্তির' উন্নয়নের যুদ্ধে নামে। এ সময়টা মুসলিমদের অবনতির কারণ লোভ, ভোগ, উপভোগ, আলস্য ও বিলাসিতা এবং তমসা লিপ্ত কামনায় ডুবে যায়। খৃস্টান শক্তি মুসলিম উত্থানকে কোন দিনই ভালচোখে দেখেনি দীর্ঘ দিন ধরেই। বাতিলের বিরুদ্ধে বজ্র কঠোর সিদ্ধান্ত ও শপথ নিয়ে যারা ময়দানে জানবাজি রেখে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তারা অবশ্যই সফলতা লাভ করেছেন। ইতিহাস তার বাস্তব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। মুসলমানরা কোন দিনই বাতিল শক্তির সামনে মাথানত করেনি আর করবেও না। তাদের ঈমানী তাকিদেই তারা শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ দুর্যোগ মূহুর্তে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেন বলে কুরআনে প্রমাণ হয়েছে। সুলতান সালাহ্উদ্দীনের মত ঈমানচেতা সাহসী মানুষের পক্ষে খৃষ্টানদের মুকাবিলায় চুপ থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি

খৃষ্টানদের ক্রুসেডের অভিলাষ চিরতরে বিলুপ্ত করার জন্য তার বাহিনী সমেত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং বিজয় মাল্যে ভূষিত হন। মুসলিম বিশ্ব তাঁর কাছে চির ঋণী।

ক্রুসেড যুদ্ধের তথ্য কণিকা

ক্রুসেডকাল ঃ ১০৯৫-১২৯১ সাল পর্যন্ত।

১০৯৯ সাল ঃ প্রথম ক্রুসেডেই জেরুজালেম দখল হয় খৃষ্টান শক্তি দ্বারা।

১১৮৭ সাল ৪ জুলাই ঃ হিত্তিনের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভ।

সৈন্য সংখ্যা ঃ (খৃষ্টান) ২০,০০০ (হাজার) নাইট ২০০০, বাদবাকী পদাতিক সৈন্য। (মুসলিম) ১৮,০০০ (হাজার)।

ক্রুসেডার তিন শক্তি

১. ইউরোপের খৃষ্টান শক্তি।

২. মধ্য প্রাচ্যের ইহুদী শক্তি।

৩. ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি।

মুসলিম বিশ্বের দুর্যোগের তিন কাল

১. ক্রুসেডের সময়- (১০৯৬-১২৯১ সাল)।

২.মঙ্গোল বাহিনীর আগ্রাসনের সময়।

৩. বর্তমান পশ্চিমাদের অব্যাহত আগ্রাসন জাল।

একনজরে

সুলতান সালাহ্উদ্দীনের জীবনপঞ্জী

১১৩৮ সাল (৫৩২ হিঃ) ঃ জন্ম গ্রহণ।

জন্মস্থান ঃ ইরাকের তিকরিত।

১১৬৪ সাল ঃ জেহাদে জড়িয়ে পড়েন।

১১৬৯ সাল ঃ ফাতেমীয়দের প্রধান উজির পদ লাভ।

১১৭১ সাল ঃ মিসরের ক্ষমতা লাভ।

১১৭৪ ঃ সিরিয়াকে নিজ সালতানাতের অন্তর্ভূক্ত করণ।

- সুন্নি মাযহাব চালু ।

- মুহয়ী দাওলাত আমীরুল মুমেনীন বলে পরিচয় দান।

১১৮৭ সাল ২ অক্টোবর ঃ জেরুজালেমে প্রবেশ।

(৫৮৩ হিঃ ২৭ রজব)

১১৯২ সাল ঃ তৃতীয় ক্রুসেডারদের সাথে চুক্তিকরণ।

১১৯৩, ৪ মার্চ (৫৮৯ হিঃ) ঃ ইনতিকাল, দামেশকে প্রথম দাফন।

১১৯৫ সাল ঃ উমাইয়া মসজিদের উত্তরে স্থায়ী কবরে রাখা হয়।

বয়স ঃ ৫৫ বৎসর।

শাসনকাল ঃ ২৫ বৎসর।

প্রিয় স্থান ঃ সিরিয়া।

প্রিয় সখ ঃ অধ্যয়ন।

প্রিয় বিষয় ঃ ধর্মতত্ত্ব।

প্রিয় চাহিদা ঃ জিহাদে শাহাদাত।

সংক্ষিপ্ত জীবনালেক্ষ্য

আমি যুগ শ্রেষ্ঠ বীর সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর বিস্তারিত জীবনী আলোচনার পর এখানে সংক্ষিপ্ত জীবনালেক্ষ্য তুলে ধরতে চাই।

আমরা জানি ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য সমর-নায়কের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। দিকে দিকে তৌহিদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে তারা অমর হয়ে আছেন। তবে সেরাদের মধ্যেও যারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলংকৃত করে আছেন, তাদের অন্যতম হলেন গাজী সালাহউদ্দীন। শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসে তার নামটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে।

অথচ সালাহউদ্দীন চেয়েছিলেন একজন ধর্মতত্ত্ববিদ হতে। অবশ্য, আল্লাহ কাকে কোন দায়িত্বের জন্য মনোনীত করেন, তা বুঝা মুশকিল। যে বালকটি একজন বড় আলেম হতে চেয়েছিলেন, পারিপার্শ্বিকতায় এবং যুগের প্রয়োজনে তিনি হলেন, বিশ্বের অন্যতম সেরা যোদ্ধা এবং গাজী। ইসলামের প্রধান তিনটি মসজিদের অন্যতম বাইতুল মুকাদ্দাস এবং তিনটি প্রধান শহরের অন্যতম জেরুজালেম খৃস্টান জবর-দখলকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকারী। অবশ্য ধর্মতত্ত্ব নিয়েই তিনি সাধনা করে গেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করে গেছেন।

মুসলিম বিশ্বে সালাহউদ্দীন নামে পরিচিতি হলেও পশ্চিমারা তাকে সালাদিন হিসেবেই জানে। তার পুরো নাম আল মালিকুন নাসির আবুল মুজাফফর ইউসুফ ইবনে আইয়ুব। ১১৩৮ সালে (হিজরী ৫৩২ সাল) ইরাকের তিকরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আইয়ূব ও চাচা শিরকুহ সেলজুক সুলতানদের অধীনে ছিল আমেনিয়ার দিন অঞ্চলে। জাতিগতভাবে তারা ছিলেন কুর্দী বংশোদ্ভুত। তবে পিতার চাকরির সুবাদে তাকে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছে। বাল্যকালে তিনি ধর্মতত্ত্ব নিয়েই পড়াশুনা করেছিলেন।

এক যুগ সন্ধিক্ষণে জন্মে ছিলেন সালাহউদ্দীন। মুসলিম বিশ্ব এতো টালমাটাল অবস্থায় এর আগে কখনো পড়েনি। মুসলিম বিশ্বের সামনে তিনবার মহা দুর্যোগকাল এসেছিল। প্রথমবার ক্রুসেডের সময়। দ্বিতীয়বার মঙ্গোল বাহিনীর আক্রমণের সময়। এবং তৃতীয়টি বর্তমানে চলছে পশ্চিমাদের আগ্রাসনের মাধ্যমে। সালাহউদ্দীন ক্রুসেডারদের হাত থেকে

রক্ষা করেছিলেন মুসলিম বিশ্বকে। ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোল অভিযান রুখে দিয়েছিলেন মামলুক সুলতান কুতুজ এবং মহান সিপাহ্সালার বেবারস। এবারের তৃতীয় দফা থেকে মুসলিম বিশ্বকে কে রক্ষা করেন, তাই দেখার বিষয়।

জেরুজালেম উদ্ধার করার নামে ইউরোপিয়ান শক্তিবর্গ ক্রুসেড শুরুর ঘোষণা দিলেও অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, ইউরোপে তখনকার মারাত্মক দুর্ভিক্ষ এবং অপশাসন জনিত কারণে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রবল ক্ষোভের যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার জন্য রাজন্যবর্গ পাদ্রীদের প্ররোচণায় ক্রুসেডের ডাক দিয়েছিলো। ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডেই খৃস্টান শক্তি জেরুজালেম দখল করে নেয়। ক্রুসেডারদের পরবর্তী লক্ষ ছিলো ক্রমান্বয়ে পুরো মুসলিম বিশ্ব দখল করার। তখনকার মুসলিম বিশ্ব ছিলো নানা ভাগে বিভক্ত। বাগদাদে খলীফা সিংহাসনে আসীন থাকলেও তিনি ছিলেন নামমাত্র। জেরুজালেমসহ আশ পাশের মুসলিম এলাকাগুলো ছিলো নানাভাগে বিভক্ত। বর্তমানের মতো জাতীয়তাবাদী চেতনা না থাকলেও মুসলিম শাসকরা নানা ফেরকায় বিভক্ত ছিল। মিসরের ফাতেমীয়রা তো আব্বাসীয়দের খলীফা হিসেবেই স্বীকার করতো না। জেরুজালেম মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করতো। কিন্তু সবাইকে একত্রিত করা এবং একটি সম্মিলিত ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনি এক প্রেক্ষাপটে সালাহউদ্দীনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো। মিসর আক্রমণকারী ক্রুসেডারদের প্রতিহত করার জন্য ১১৬৪ সালে চাচা শিরকুহর ডাকে সাড়া দিয়ে সালাহউদ্দীন জিহাদে জড়িয়ে পড়েন। তখনই নতুন এক সালাহউদ্দীনের আত্মপ্রকাশ ঘটে যায়। বাকী জীবন তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। শিরকুহর অক্লান্ত পরিশ্রমে মিসর ক্রুসেডারদের হাত থেকে রেহাই পায়। শিরকুহ মিসরে ফাতেমীয়দের প্রধান উজিরের দায়িত্বও পালন করছিলেন। ১১৬৯ খৃস্টাব্দে তার ইন্তেকালের পর সালাহউদ্দীন উক্ত পদে তার স্থলাভিষিক্ত হন। এবার তিনি জেরুজালেম মুক্ত করার বাস্তব ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ কাজে তিনি কম বাধার সম্মুখীন হননি। ক্রুসেডাররা তো বাধা হিসেবেই ছিল। কিন্তু স্বধর্মের স্বার্থান্বেষী লোকের সংখ্যা ও কম ছিল না। জেরুজালেম মুক্ত করতে গিয়ে তিনি যতগুলো যুদ্ধ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে।

এমতাবস্থায় একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বাহিনী গঠনের কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন।

১১১৭ সালে ফাতেমীয় সুলতান আল আদিলের ইন্তেকালের পর তিনি মিসরের ক্ষমতা লাভ করেন। ১১৭৪ সালে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ইন্তেকাল করলে তিনি সিরিয়াকেও নিজের সালতানাতের আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফার স্বীকৃতিও লাভ করেন। তিনি মিসরে দীর্ঘদিন পর আবার সুন্নি মাযহাব পুনরায় সরকারীভাবে চালু করেন। ফলশ্রুতিতে মোটামুটিভাবে একটি সম্মিলিত মুসলিম ফ্রন্ট তৈরী করতে সক্ষম হন যা ছিল দীর্ঘ দিনের চাহিদা। তিনি নিজের পরিচয় দিতেন, 'মুহয়ী দাওলাত আমীরুল মুমেনীন বা মুমিনদের নেতা। সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে।

এবার তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস তথা জেরুজালেম মুক্ত করার দিকে অগ্রসর হন। চূড়ান্ত জিহাদে নামার আগে তিনি ক্রুসেডারদের শক্তিমত্তা যেমন বিশ্লেষণ করেছিলেন, তেমনি দুর্বলতার দিকেও নজর রেখেছিলেন। সম্ভাব্য সব পরিস্থিতিই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। অবশেষে ১১৮৭ সালে তিনি তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হন। তিনি তার নিজের পছন্দের পানিশূন্য ও বন্ধুর জায়গায় যুদ্ধ করার জন্য জেরুজালেমের রাজা গাইকে প্রলোভিত করেন। সেই ফাঁদে ধরা দেন তিনি। একই সালের ৪ঠা জুলাই হিত্তীনে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই এ নামেন। ক্রুসেডারের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। এদের মধ্যে দু'হাজার নাইট আর বাকীরা পদাতিক। অন্যদিকে সালাহউদ্দীনের ছিল প্রায় ১৮ হাজার সৈন্য। সালাহউদ্দীনের পরিকল্পিত ব্যবস্থার কারণে মূল যুদ্ধ শুরুর আগেই ক্ষুধা, পিপাসায় কাতর হয়ে ক্রুসেডারদের যুদ্ধ করার শক্তি মারাত্মকভাবে কমে যায়। ৪ঠা জুলাই মুসলমানরা যখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন তাদেরকে আর যোদ্ধা বলে মনে হয়নি। তারা নির্জীব জড়োখণ্ডে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধে রাজা গাই বন্দি হন। খৃস্টান বাহিনীর প্রায় সকল নাইট হয় নিহত কিংবা মুসলমানদের হাতে বন্দি। খৃস্টানরা তাদের জোশ বাড়ানোর জন্য যুদ্ধের ময়দানে মূল ক্রুশটিও নিয়ে এসেছিলো। সেটিও মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে। এ যুদ্ধই ছিলো জেরুজালেম খৃস্টান শক্তির পরিসমাপ্তি। এরপর জেরুজালেম মুসলমানদের হাতে যাওয়াটা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরপর গাজী হিসেবে সালাহউদ্দীন ১১৮৭ সালের ২রা অক্টোবর (৫৮৩

হিজরীর ২৭শে রজব) জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। বাইতুল আকসাসহ জেরুজালেম আবার মুসলমানদের হাতে আসে।

তবে জেরুজালেম উদ্ধারের চেয়ে তা রক্ষাতেও সালাহউদ্দীনের কৃতিত্ব কম ছিলো না। মুসলমানদের হাতে জেরুজালেমের কর্তৃত্ব ফিরে যাওয়ার সংবাদে ইউরোপে আবার মাতম শুরু হয়। পুরো ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৃতীয় ক্রুসেডের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নেয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানসহ প্রায় সব ইউরোপিয়ান শক্তি এই আগ্রাসনে শরীক হয়। এতে ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড, ফ্রান্সের ফিলিপ পারস্পরিক সব বৈরিতা ভুলে ক্রুসেডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১১৮৯ সালে তারা এই ক্রুসেড শুরু করেন। খৃস্ট শক্তি এতো বিশাল বাহিনী নিয়ে আর কখনো ক্রুসেডে আসেনি। কিন্তু তারা অবিরাম সংগ্রাম করেও জেরেুজালেম আর দখল করতে পারেনি। শেষে তারা মুখ রক্ষামূলক একটি চুক্তিতে আসে। ১১৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি ক্রুসেডারদের সাথে একটি সাময়িক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে ৩ বছর ৮ মাসের জন্য একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। তিনি যদি সে সময় অন্যান্য স্থান থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতেন, তবে খৃস্ট শক্তিকে আরো শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে পারতেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক মাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন মাত্র ৫৫ বছর বয়সে।

ক্রুসেডের ঘটনা প্রবাহ

১ম ক্রুসেড	সাল	দখলকৃত স্থান	খৃষ্টান নেতৃত্ব	মুসলিম নেতৃত্ব	বিজয়ী
	৯৬৯	খৃষ্টান ফিলিস্তিন ও সিরিয়া			ফতেমীয়ারা
	১০৭১	জেরুজালেম			সেলজু করা
	১০৯৫	কাউন্সিল আহবান			

	১০৯৮	এডিসা, এন্টিয়ক			খৃষ্টান
	১০৯৯	জেরুজালেম			খৃষ্টান
	১১০১	জাফা, আক্রা, সিডন, বৈরুত	রাজা বলডুইন		খৃষ্টান
	১১০৯	ত্রিপলি			ত্রিপলি
২য় ক্রুসেড	১১৪৪	এডিসা		ইমামুদ্দীন জংগী	মুসলমান
	১১৪৪	আলেপ্পো, হারবাণ ও মসুল		আতাবেগ ইমামুদ্দীন	মুসলমান
	১১৪৬	জেরুজালেম ব্যতীত সকল স্থান	সেন্ট বার্ণার্ড	নুরুদ্দীন জঙ্গী	মুসলমান
	১১৬৭			সালাহ্উদ্দীনের মিসর বাহিনীতে যোগদান	
	১১৭৪			সুলতান পদ লাভ	
	১১৭৫			পূর্ণ ক্ষমতা লাভ	

	১১৮৭	হিত্তিনে বিজয়	গী দ্য লুসিনান, পাদরী রেজিনাল্ড	সালাহ্উদ্দী ন	মুসলিম বাহিনী
	১১৯২	চুক্তি পত্র	রিচার্ড	ঐ	সন্ধি
	১১৯৩	মৃত	-	ঐ	-
৩য় ক্রুসেড	১১৯৩ থেকে ১২৯১ পর্যন্ত				
৪র্থ ক্রুসেড	১১৯৫	সিসিলি দখল	পোপ তৃতীয় সেলেসাইন	পুত্র আদিল	সন্ধি হয়
	১১৯৮	-	-	-	সন্ধি হয়
৫ম ক্রুসেড	১২০১		পোপ তৃতীয় ইনসোনেন্ট		
৬ষ্ঠ ক্রুসেড	১২১৬		তৃতীয় ইনসোনেন্ট	আদিল শাহ	মুসলিম
	১২২১	-	ঐ	-	সন্ধি
৭ম ক্রুসেড	১২৩৮	জেরুজালেম	৭ম গ্রেগরী	আল কামিল	খৃষ্টান
৮ম ক্রুসেড	১২৪৪	জেরুজালেম পুনরুদ্ধার	ঐ	আস সালিহ	মুসলিম
শেষ ঘটনা	১২৯১	আক্রা পতন	ঐ	মামলুক সুলতান আশরাফ খলীল	মুসলিম
	১৩৯৬	নাইকোপলিসের যুদ্ধ	খৃষ্টান বাহিনী	প্রথম বায়েজিদ	মুসলিম

	১৪৫৩	কনষ্টান্টিনোপল	অটোমানরা	সুলতান সোলাইমান	তুর্কিরা
	১৪৫৩	বাইজানটাইন			
	১২০০	মঙ্গোলদের উত্থান			
	১২০৬	তেমুচিন উপাধি লাভ			
	১২২৫	কারসিখ তাই রাজ্য	খিতাই		মঙ্গোলরা
	১২১১-১২	উত্তর চীন			মঙ্গোলরা
	১২১৫	পিকিং			মঙ্গোলরা
	১২২০	ট্রান্স-অক্সিয়ানা			মঙ্গোলরা
	১২৩১-৩৪	কোরিয়া পতন	চেঙ্গিস খান		মঙ্গোলরা
	১২৪০	ইউক্রেন ও পোলান্ড	চেঙ্গিস খান		মঙ্গোলরা
	১২৪১	লিগনীজ	চেঙ্গিস খান		মঙ্গোলরা
	১২৫১-৫৯	দক্ষিণ চীন	চেঙ্গিস খান		মঙ্গোলরা
	১২৪৫-৪৭	পোপের প্রেরিত যাজক মহাচীনের মঙ্গোল দরবারে গমন			
	১২৪৯-৫২		২য়	মিশন	মঙ্গোলরা
	১২৫৩-৫৫		৩য়	মিশন	মঙ্গোলরা
	১২৫৫-৫৬	বাগদাদ আক্রমণ			

	১২৫৯	দামেশক			
	১২৬০	আলেপ্পো দখল			
	১২৯৪	কুবলাই খানের মৃত্যু			
	১২৯৫	ইরানে ইলখানের ইসলাম কবুল।			

" এভাবেই ১২৪৫-১২৯৫ সাল নাগাদ মোঙ্গলদের উপর খৃষ্টানদের সকল আশা-আকাংখা গুড়ে বালি পড়ে।"

খৃষ্টান বাহিনীর গণহত্যার লোমহর্ষক বর্ণনা

১২১৬ খৃষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনসোনেন্ট সূচনা করে ষষ্ঠ ক্রুসেড, তাতে ২০০০০০ (দু' লক্ষ) খৃষ্টান ধর্ম যোদ্ধা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। সেই সূত্রে খৃষ্টান যোদ্ধারা মিসর ও ডালমেটিয়া গমন করে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) মানব সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অপরদিকে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে হিত্তীনের যুদ্ধে ক্রুসেডার ফ্রাঙ্ক বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বন্দি হন প্যালেষ্টাইন রাজা গী দ্য লুসিনান ও পাদরী নেতা রেজিনাল্ড। সুলতান মুক্তি দেন রাজা লুসিনানকে আর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন চরম অত্যাচারী মক্কা-মদীনা ধ্বংসের ঘোষণাকারী রেজিনাল্ডকে। কি এক মহানুভবতা?

এর আগে, প্রথম পর্যায়ে ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানীর ক্রুসেডারগণ এশিয়া মাইনর দখল করে। ১০৯৮ সালে দখল করে এডিসা ও এন্টিয়ক এবং ১০৯৯ সালে দখল করে জেরুজালেম। এন্টিয়কে খৃষ্টান যোদ্ধারা প্রায় ১০,০০০ (দশহাজার) মুসলমানকে হত্যা করে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. মহা পবিত্র আল-কুরআন।
২. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব।
২. ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত- আশকার ইবনে শাইখ।
৪. ইসলামের ইতিহাস।
৫. বাগদাদের কান্না।
৬. ইসলামী বিশ্বকোষ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৭. মনিষীদের জীবনী সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ।
৮. মাসিক মদীনা।
৯. সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।
১০. দৈনিক ইনকিলাব।
১১. দৈনিক সংগ্রাম।
১২. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান।

১১৭৫ সালে বাগদাদের খলিফা আল-মাগরিব, মিসর, লিবিয়া, ফিলিস্তিন, পশ্চিম আফ্রিকা, ও মধ্য এশিয়ার অধিপতিরূপে সালাহ উদ্দিন আইয়ূবীকে ফরমান দান করেন। ফলে তিনি প্রাচ্যের মুসলিম শক্তির প্রধানতম পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি খৃষ্টান বাহিনীকে ১১৮৭ সালে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ক্রুসেডারদের স্তব্ধ করে দেন।

আজ আবার নব্য ক্রুসেডাররা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আফগান, ইরাক , ফিলিস্তিন, বসনিয়া, কাশ্মীরে অসহায় মুসলিম নারী শিশুদের আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস ভারি হচ্ছে। তাই আজ আরেকজন সালাহউদ্দিনের বড়ই প্রয়োজন।

বর্তমান প্রজন্মকে নতুনভাবে বীরত্বের কাহিনী জানানো ও অনুপ্রাণিত করার তাকিদেই আমরা সালাহউদ্দিন আইয়ূবীর জীবনী প্রকাশ করলাম।

দারুল উলূম লাইব্রেরী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ । মোবাইল : ০১৭২-৫০৭৮৭৭